ব্রিগেডে খেটে খাওয়া মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশ থেকে আসন্ন ধর্মঘট সফল করার আহ্বান

২০ এপ্রিল '২৫ দিন আনি দিন খাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা লোকেদের স্পর্ধা দেখাল ব্রিগেড, আর দেখল গোটা দুনিয়া। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, ক্ষেতমজুর সংগঠন এবং বস্তিবাসীদের সংগঠনসমূহের যৌথ আহ্বানে শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে ব্রিগেডে জনসমুদ্র দেখলো শুধু কলকাতা নয়, গোটা দুনিয়া।

বিকেল সাড়ে তিনটায় ছিল কর্মসূচী শুরুর সময়। সকাল থেকেই কলকাতার সবক'টি রাজপথ, অলিগলির দখল নিল ব্রিগেডমুখী মিছিল। সেই মিছিলগুলির শরীরী ভাষা স্লোগান সবকিছুর মধ্যেই ছিল ভিন্নতা। যা বামেদের ডাকা অন্যান্যবারের ব্রিগেডের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রখর দাবদাহে মিছিলে হাঁটা ঐ মানুষদের মাথায় ছাতা তো নয়ই, কোনো টুপিও ছিল না। কারণ ঐ মানুষগুলি তো এতেই অভ্যস্ত। প্রখর দাবদাহ হোক বা প্রবল ঝড়বৃষ্টি ঐ মানুষগুলি তার মধ্যেই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। যে খাটুনির বিনিময়ে হাতে আসে না পর্যাপ্ত আয় বা ন্যায্য পাওনা। আর ২০ এপ্রিল তাদের কিছু হারাবার দিন নয় বরং সব পাওয়ার দিন ছিল। ছিল তাদের শোষকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার হিম্মতের দিন। কাজেই প্রখর দাবদাহ তাদের কাছে যেন প্রকৃতির ভালোবাসার পরশ। প্রতিপক্ষ এই সমাবেশ ভণ্ডুল করতে নানা কৌশল নেবার চেষ্টা করেছে। মহল্লায়, বস্তিতে প্রান্তিক মানুষদের হুমকি বাস চালক, টোটো চালক, ম্যাটাডোর চালকদের হুমকি ইত্যাদি তো ছিলই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যখন দেখা গেল ব্রিগেডমুখী প্রত্যয়ী জনস্রোতকে আটকানো যাচ্ছে না তখন হাওড়ায় ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হল। তাও মানুষকে রোখা যায়নি। ঐতিহাসিক সমাবেশের সাক্ষী থাকল ব্রিগেড গত ২০ এপ্রিল।

সমাবেশে সি আই টি ইউ, সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত খেত মজুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতা মহম্মদ সেলিম। ১২ই জুলাই কমিটির উদ্যোগে ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে মিছিল করে ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেন শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং অবসরপ্রাপ্তরা।

ব্রিগেড সমাবেশের সম্মিলিত সুর হল রুটি-রুজির লড়াই, হকের লড়াইয়ে বিভাজনের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করছে শাসকেরা। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে লড়াই করে শাসককে পরাস্ত করতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষের এই ব্রিগেডের আরও আহ্বান, আগামী ২০ মে '২৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারকে জোর ধাক্কা দিতে হবে। □

২০ মে, ২০২৫

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্য কনভেনশন

গত ২৪ মার্চ, ২০২৫ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহের যৌথ মঞ্চের ডাকে আগামী ২০ মে, ২০২৫ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে মৌলালী যুবকেন্দ্রে রাজ্য কনভেনশন আয়োজিত হয়। কনভেনশনে উপস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের নেতৃত্ব বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এলাকায় এলাকায় নিবিড় প্রচার চালাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ১৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই ধর্মঘট। এরাজ্যে মমতা ব্যানার্জীর সরকার এই ধর্মঘটকে বানচাল করতে সক্রিয় হলে তা কড়া ভাবে মোকাবিলা করা হবে— কনভেনশন থেকে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

- ধর্মঘটে শামিল হবেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ
- ২ মে '২৫ স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান
- ৫ মে '২৫ কেন্দ্রীয় জমায়েত, এন্টালী মোড়

কনভেনশনে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু। কনভেনশনটি পরিচালনা করেন সুভাষ মুখার্জী, সুজন নাহা, নবেন্দু দাস, শান্তি ঘোষ, মনোহর তিরকে, গজনেন্দ্র রায়, রাম নারায়ণ শা, বাসুদেব গুপ্ত, শিশির রায়, শ্রীজিত সেনগুপ্ত ও মনোজ সাউকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে অনাদি সাহু বলেন, দেশ ও দেশের শ্রমজীবী জনগণ এক দুর্বিষহ

● পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্যে নজিরবিহীন নিয়োগ দুর্নীতি

২৫৭৫৩ জন শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল

৩ এপ্রিল ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এক কলঙ্কিত দিন হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালে পরীক্ষার পরবর্তী শিক্ষক শিক্ষাকর্মী হিসাবে যারা এস এস সি-র মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার-এর বেঞ্চ তাদের পুরো প্যানেলটাকেই বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রেখে। ফলে চাকুরিহারা হলেন ২৫৭৫৩ জন। যদিও এই ২৫৭৫৩ জনের মধ্যে ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসের চাকরি বহাল থাকবে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে। সুদীর্ঘ সেই বহমান উজ্জ্বল ইতিহাস আজ কলঙ্কিত। এ রাজ্যের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ যারা গড়বেন সেই শিক্ষকদের নিয়োগে দুর্নীতি। এই দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এই রাজ্যেরই মন্ত্রী এবং আমলারা যাদের দায়িত্ব ছিল স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করে সুযোগ্য নিয়োগ প্রার্থীদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা। শিক্ষা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যেখানে নিয়োগ হওয়ার কথা সেখানে নিয়োগ নাকি অর্থের বিনিময়ে / ঘুষের বিনিময়ে হয়েছে। ২০১১ সালে 'বদলা নয়, বদল চাই'—শ্লোগানে মুখরিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২০১৬-র ১৬ ফেব্রুয়ারি এস এস সি নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তার আগে ২০০৭ সালের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বদল করে ২০১৫ সালে নতুন আইন আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে আবারও বদল হয় সেই আইনের। এলো নতুন আইন। পরীক্ষা নেওয়া হয় ২৭ নভেম্বর। পরীক্ষা হয় ও এম আর শীটে। ২০১৮-র ১২ মার্চ প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত প্যানেল। ২৮ আগস্ট প্রকাশিত হয় প্রার্থীদের মেধাতালিকা। ২০১৯-এর জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষক হিসাবে চাকরি পান নির্বাচিতরা।

২০১৬-র প্যানেল দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে ২০২১ সালে। কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মী, নবম-দশম এবং একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে প্রথম মামলাটি করেছিলেন বৈশাখী ভট্টাচার্য নামক একজন (WPA No. 30649 of 2016)। তিনি বয়সের ছাড় না পেয়ে মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে। পরবর্তীতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ এনে পিটিশন দাখিল হয়। আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের বিষয়টি সামনে আসলেও আসলে ২০১৬ সালের এস এস সি-তে পরীক্ষার্থী ছিল ২২ লক্ষ। ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার বাদে বাকিরা দেখলো নিয়োগে স্বচ্ছতা নেই। তারা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এবং এই বিপুল সংখ্যক বঞ্চিত অথচ নিজেদের যোগ্য মনে করা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও তাঁর টিম। শুরুর দিকে বেশ কিছু মামলায় একাধিক বেআইনি নিয়োগ বাতিল হতে থাকে। একটি পর্যায়ে প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস বাগের নেতৃত্বে তৈরি হলো বাগ কমিটি। কমিটি রিপোর্ট দিল ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে নিয়োগে। প্রায় ৯৭০ জন শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়েছে যাদের নাম হয় কখনোই প্যানেলে ছিল না, অথবা প্যানেলের লাইফ এক্সপায়ার এরপর নিয়োগ হয়েছে। বিপুল সংখ্যক নিয়োগের বৈধতা ছিল তদন্ত সাপেক্ষ। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের আদেশ দেয়। অবশেষে সরকার এবং কর্তৃপক্ষের হলফনামা বিবেচনা সাপেক্ষে ২২ নভেম্বর ২০২১ সমস্ত গ্রুপ-ডি নিয়োগ বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্ট। একইভাবে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২-এ সমস্ত গ্রুপ সি নিয়োগ বাতিল করে হাইকোর্ট। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সিবিআই, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনের হলফনামা বিবেচনা করে প্রায় ছয় হাজারের কাছাকাছি নিয়োগ অবৈধ বলে ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। এরপরেই দ্রুততার সঙ্গে এই সমস্ত নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তথাকথিত অযোগ্য প্রার্থীরাও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের করা সেই মামলাতে যুক্ত হয় তাদের চাকরি খারিজের আদেশনামা প্রত্যাহারের জন্য। ২০২৩-এর ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ জানিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবেন, সেখানেই এ সংক্রান্ত নিয়োগ দুর্নীতির যাবতীয় তদন্ত হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ২০২৪-এর ১৫ জানুয়ারি বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির বিশেষ বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শুরু হয় জানুয়ারি থেকে মার্চ তিন মাসে মোট ১৭টি শুনানির পর।

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আবারও রক্তাক্ত কাশ্মীর

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চাই সৌভাতৃত্ব, সম্প্রীতি এবং ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলা

আরও একবার সন্ত্রাসবাদী হামলায় রক্তাক্ত হলো কাশ্মীর উপত্যকা। মুহূর্তের মধ্যে 'ভূস্বর্গ' বদলে গেল মৃত্যু উপত্যকায়। ২২ এপ্রিল জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র পহেলগামের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গিদের কাপুরুষোচিত, বর্বর হামলায় নিহত হলেন ২৬ জন নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ। এদের মধ্যে তিনজন আমাদের রাজ্যের। নিহতদের মধ্যে পর্যটক ছাড়াও রয়েছেন টাট্টুঘোড়ায় পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো সৈয়দ আদিল হুসেইন শাহের মতো স্থানীয় সাধারণ মানুষ। প্রতিদিনই ট্যুরিস্টদের ভিড়ে মুখর থাকে বৈসরণ উপত্যকা। ২২ তারিখও ব্যতিক্রম ছিল না। জঙ্গলের ভেতর থেকে আচমকা বেড়িয়ে এসে নিরীহ মানুষদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে মানবতাবিরোধী সন্ত্রাসবাদীরা। একের পর এক পর্যটকের গুলিবিদ্ধ দেহ লুটিয়ে পড়ে ভূস্বর্গের মাটিতে। স্বামীর মৃতদেহের পাশে অসহায় স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর ছবি, ভিডিও শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে সমগ্র দেশবাসীকে। নদীয়ার তেহট্টের যুবক ঝন্টু আলি শেখ সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে উধমপুরে কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন চালানোর সময় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।

যাঁরা প্রাণে বাঁচলেন, তাঁরা অনেকেই কয়েক কিলোমিটার রাস্তা প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে জঙ্গিদের গুলিবর্ষণের মধ্যে নিচে নেমে আসতে পেরেছিলেন। নিচে সেনার দেখা পাওয়া গেলেও হামলার সময় বৈসরণ উপত্যকায় সেনাবাহিনীর দেখা পাওয়া যায়নি। এই নিরাপত্তাজনিত ত্রুটির সুযোগ নিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। স্থানীয় গাইড, টাট্টুঘোড়ার সহিসরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও জঙ্গিদের বুলেট থেকে পর্যটকদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এদেরই একজন অনন্তনাগের বাসিন্দা নিহত সহিস সৈয়দ আদিল হুসেইন, মেহমান পর্যটকদের বাঁচাতে এক জঙ্গির হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই অবস্থায়

● পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
মার্চ-এপ্রিল ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
বাহান্নতম বর্ষ □ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

২০ মে-র সাধারণ ধর্মঘটের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী

''একটি দেশে কী ঘটছে তার সুন্দর ছবি তুলে ধরে ধর্মঘট; বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্র ব্যারোমিটারের মতো ধর্মঘট হল দেশের আর্থিক অবস্থার মান নির্ণয়ের যন্ত্র। আমাদের দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং মজুরির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানই ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অবশেষে ধর্মঘট সৃষ্টি করে। আসল কথা হল ভারতে এই ব্যবধান আছে। হয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে নতুবা মজুরি বৃদ্ধি করেই এই ব্যবধান দূর করা সম্ভব। আমি লক্ষ্য করেছি বিপুল সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, আর অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক মানুষ মূল্যবৃদ্ধির বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে ধর্মঘট তো ঘটবেই... এই ধর্মঘটের মীমাংসা আমরা কীভাবে করব? কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়।... সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান।''—এই বক্তব্য কোনও বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতার নয়। ১৯৪৬ সালে ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করে জওহরলাল নেহরু ধর্মঘট প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করেছিলেন। ধর্মঘট যে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় সংগঠিত হয় তাকে তিনি উপলব্ধির মধ্যে এনেছিলেন। জওহরলাল নেহরু যখন এই মন্তব্য করছেন তখন তিনি কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ হিসাবে কাজ করেছিলেন এটা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্মঘট নিয়ে তাঁর এ ধরণের উপলব্ধি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে রাজ্যের বা কেন্দ্রের শাসনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা ধর্মঘটকে শ্রমিক-কর্মচারীর আন্দোলন সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে মান্যতা দেয় না। কর্পোরেটদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা সরকার পরিচালনা করে। কর্পোরেট স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমকোড নিয়ে এসেছে, শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করতে চাইছে, ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

সাধারণভাবে শাসকের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে ধর্মঘট করে কোনো লাভ হয় না, উল্টে শ্রমদিবস নষ্ট হয়। নয়া উদার অর্থনীতি দেশে চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ২২টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক বহু ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে। তথ্য বলছে এই সমস্ত ধর্মঘটগুলির ফলে যা শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার বহুগুণ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে মালিকপক্ষের বিভিন্ন কারখানা লকআউট ঘোষণার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত, ধর্মঘটের সাফল্য ধর্মঘটের পরবর্তীতে দাবিগুলি অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা এক ধরনের মাপকাঠি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে স্যামসাঙ কারখানাতে শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ অন্যান্য দাবিদাওয়াকে মান্যতা দেওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতেও বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের আশু সাফল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তা শ্রমিকদের মানসিক শক্তি দেয়। পরবর্তী আন্দোলনগুলিকে উজ্জীবিত করে। কিন্তু ধর্মঘট বা অন্য কোনো ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের সাফল্যের মাপকাঠি কেবলমাত্র সেই সংগ্রামের অব্যবহিত পরে পাওয়া সাফল্যের হিসাব নিকেশের মধ্যেই নিহীত থাকে না। ধর্মঘটের সুদূর প্রসারী সাফল্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নয়া উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের এযাবৎকালের ২২টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট এবং বিরামহীন নানাবিধ আন্দোলন করে চলেছে।। কেন্দ্র, রাজ্য উভয়ক্ষেত্রেই এই লাগাতার আন্দোলনের সুদূর প্রসারী ফলাফলের অন্যতম একটা উদাহরণ হল ব্যাঙ্ক, বীমা ক্ষেত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র অনেক চেষ্টা করেও আজও পুরোপুরি বেসরকারীকরণ করতে পারেনি দেশের শাসককুল। নরসীমা রাও থেকে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টার কোনো কসুর রাখেনি। তা সত্ত্বেও তারা কাঙ্খিত ফল লাভ করেনি লাগাতার তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের চাপে। সে কারণেই আজকে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লেগেছে মোদী বাহিনী।

আমাদের রাজ্যের বর্তমানে শাসন চালাচ্ছে একটি স্বৈরাচারী সরকার। শ্রমিক-কর্মচারীর গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজ্যের শ্রমজীবীরা যেমন আন্দোলনের রাস্তায় আছে, এ রাজ্যের কর্মচারী-শিক্ষকরাও ধারাবাহিক সংগ্রামে লিপ্ত। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সার্ভিস রুল দ্বারা স্বীকৃত হলেও তা আজ তৃণমূল সরকার কেড়ে নিতে চাইছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আন্দোলন সংগ্রাম যদি সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এবং বৃহত্তর ঐক্য গড়ে ওঠে, তাহলে স্বৈরাচারী শাসকও মাথা নত করে। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী এই সরকারের কাছ থেকে প্রতিটি মহার্ঘভাতার কিস্তি, বেতন কমিশনের সুপারিশ ইত্যাদি সবকিছুই আদায় করা গেছে তীব্র সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘটকেও এই সরকার তার শ্রেণী স্বার্থেই নিদারুণভাবে আক্রমণ করেছে। প্রতিটি ধর্মঘটে ধর্মঘটী কর্মচারীরা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে বৃহত্তর ঐক্যের মঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে এবং ১০ মার্চ ২০২৩ বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তুলে, শুধু সরকারী কর্মচারীরা নয় রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সকল অংশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ধর্মঘটে শামিল হয়। সেই ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য পায়।

আবার ২০ মে '২০২৫ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি মিলিতভাবে শ্রমকোড বাতিল সহ কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করেছে। সেই ধর্মঘটে শামিল হবে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিক সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশ। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তরা সর্বভারতীয় দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং তাদের নিজেদের নানাবিধ বঞ্চনার অবসান চেয়ে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবে। বকেয়া ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, প্রতিহিংসামূলক বদলীর আদেশনামাগুলি প্রত্যাহার, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিগুলি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই মূল টার্গেট শ্রমিক কর্মচারীদের স্বীকৃত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া। কেন্দ্র যে উদ্দেশ্যে ৪টি শ্রমকোড লাগু করতে চাইছে, রাজ্য সরকার একইভাবে কর্মচারীদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। সার্ভিস রুলে স্বীকৃত ধর্মঘটের অধিকার আমাদের সর্বাত্মক ধর্মঘট করেই রক্ষা করতে হবে। কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষা দেয়।

শুধু দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করাই নয়, একটি সফল ধর্মঘট সাধারণ মানুষের মধ্যেও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় গভীরভাবে। সেই প্রভাবে দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে এমন উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর আছে। এক্ষেত্রে প্রায় ২১ বছর আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর সফল সর্বভারতীয় ধর্মঘটের উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। কেন্দ্রে তখন বিজেপির অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার। এই ধর্মঘটের সলতেয় আগুন দেওয়ার কাজ করেছিল মূলত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। টাইম মেশিনে ২১ বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক।

তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার নেতৃত্বে তৎকালীন এ আই এ ডি এম কে সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ছাঁটাই করা হতে থাকে। হাইওয়ে বিভাগের ১০ হাজার কর্মচারী সহ নানাক্ষেত্রের কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। এর বিরুদ্ধে কর্মচারীরা সংগ্রামে লিপ্ত হল। ধর্মঘট সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করতে তামিলনাড়ু এসেনশিয়াল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট বিধানসভায় পাশ করানো হয়। এর প্রতিবাদে কর্মচারী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২ জুলাই ২০২৩ থেকে লাগাতার ধর্মঘটে যায়। স্বৈরাচারী জয়ললিতা সরকার ধর্মঘট ভাঙতে কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠনগুলির দুই হাজারের বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার, তিরিশ হাজার জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে ২ লক্ষাধিক কর্মচারীকে দপ্তরগুলিতে নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে বরখাস্ত করে। সেই শূন্যপদগুলিতে ৪০০০ টাকার মাসিক বেতনে এবং অসম্মানজনক শর্তে বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগ করতে শুরু করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কর্মচারী আন্দোলনের উপর এত নিষ্ঠুর, অমানবিক আক্রমণ অতীতে হয়নি। আন্দোলনকারীরা মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। সরকারের এই কার্যকলাপের সমালোচনা না করে কর্মচারীদের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ট্রাইব্যুনালে যেতে বলে হাইকোর্ট। বরখাস্তদের কাজে ফেরানোর বিষয়ে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য হাইকোর্ট বলেনি। আন্দোলনকারীদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় লেবার প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্ট সংগঠন। ৬ আগস্ট ২০২৩ সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন সংগ্রামের অধিকারকে কার্যত নস্যাৎ করে অত্যন্ত বিতর্কিত একটি রায় প্রদান করে। রায়ের মূল বক্তব্য ছিল— জয়ললিতা সরকার কর্মচারীদের আন্দোলন ভাঙতে যথার্থ কাজ করেছে, দ্বিতীয়ত যারা বরখাস্ত হয়েছেন তারা ভবিষ্যতে আর ধর্মঘট করবেন না এই মুচলেকা দিয়ে কাজে ফিরবেন, তৃতীয়ত, সরকারী কর্মচারীদের তো নয়ই, শ্রমিকদের এমনকি রাজনৈতিক দলগুলিরও ধর্মঘট করার কোনো অধিকার নেই। শুধু তামিলনাড়ুর সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকরা নয়, গোটা দেশের শ্রমিক, কর্মচারীরা গর্জে উঠলেন সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই বিস্ময়কর রায়ের প্রতিবাদে। এই রায়ের সাতদিনের মধ্যে ১৩ আগস্ট ২০০৩ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন (বি এম এস ছাড়া) এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভারতীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ''সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস'' পালিত হল। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন আগস্ট ২০০৩-এ এন ই সি সভা করে ঘোষণা করল সেই বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সারা দেশজুড়ে ধর্মঘটে যাবে। কলকাতায় ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ মহাজাতি সদনে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। তামিলনাড়ুর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ ত্বরান্বিত হল। ২২ নভেম্বর ২০০৩ অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন অব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কাস-এর নেতৃবৃন্দ নয়া দিল্লির যৌথ বৈঠক থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের দিন ঘোষনা করল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই সময়কালে বাজপেয়ী সরকারের 'ভারত উদয়'-এর ফাঁপা বেলুন ফেটে গেছে। এন ডি এ সরকারের শ্রমজীবী মানুষ তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী নীতির কারণে হাঁসফাস করছে দেশবাসী। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন বিচক্ষণতার সাথেই পূর্ব ঘোষিত ১১ ফেব্রুয়ারর ধর্মঘটকে পিছিয়ে নিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ঐক্যবদ্ধভাবেই ধর্মঘটের অধিকার রক্ষায় ধর্মঘটে শামিল হবার ঘোষণা করল। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী, অসংগঠিত অংশের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এর ধর্মঘট অভাবনীয় সাফল্য পেল।

এই অসাধারণ সফল ধর্মঘটের প্রকৃত রাজনৈতিক বার্তা বুঝতে ব্যর্থ হল জয়ললিতা সরকার। তারা কিছু বরখাস্ত কর্মচারীদের কাজে ফেরানো ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু করল না। তার ফলও তারা পেল। কিছুদিনের মধ্যেই চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিজেপি চেয়েছিল 'শাইনিং ইন্ডিয়া' / 'ভারত উদয়' ইত্যাদি প্রচারে মানুষ মেতে উঠে তাদের ভোট দেবে। অতি উৎসাহে বাজপেয়ী লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন এগিয়ে আনলেন। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এর ধর্মঘটের যে অনুরণন গোটা দেশে পড়েছিল তার অভিঘাতে এবং জনগণের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভোটদানের মধ্য দিয়ে নির্বাচনে এন ডি এ সরকার পরাজিত হল। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার দল এ আই এ ডি এম কে এবং তার জোটসঙ্গী বিজেপি ৩৯টি আসনের একটিতেও জয়লাভ করতে পারল না। এই ধাক্কায় বোধোদয় হল স্বৈরাচারী শাসকের। নির্বাচনের পর রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের লাগাতার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তামিলনাড়ু সরকার তার প্রায় সবটাই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল। যদিও তা সত্ত্বেও সেই রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ তাঁকে ক্ষমা করেনি। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ললিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তামিলনাড়ুরবাসী।

ধর্মঘট বা যে কোনো ধরনের জঙ্গী-আন্দোলনের আশু সাফল্য পাবার অন্যতম মৌলিক উপাদান হল সাহস, বৃহত্তম ঐক্য এবং জনগণের অন্যান্য অংশের মধ্যে ব্যাপক প্রচার। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর সফল ধর্মঘট শিক্ষা দেয় যে ধর্মঘট আশু দাবি আদায়েরও উর্দ্ধে গিয়ে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাবার অনুঘটকের কাজও করে। ২০ মে, ২০২৫-এর ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক ঐক্য তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে মেহনতী মানুষ ২০ এপ্রিল ২০২৫ ব্রিগেডে সেই বার্তা দিয়েছেন। আমাদেরও বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তুলে এই ধর্মঘটে শামিল হতে হবে। মনে রাখতে হবে ২))০২৬-এ এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ধর্মঘট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করবে। তাই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার বার্তা নিয়ে আমাদের সকল কর্মচারীর কাছে অবশ্যই পৌঁছোতে হবে। □

৩০ এপ্রিল, ২০২৫

শোক সংবাদ

কমরেড স্বপন মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড স্বপন মুখোপাধ্যায় গত ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

কমরেড স্বপন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। পরে কলকাতায় তাঁর পরিবার চলে আসেন। সেখানেই তিনি তাঁর স্কুল ও কলেজের পাঠ সম্পন্ন করেন। তিনি খেলাধূলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ফুটবল খেলাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এছাড়াও টেবিল টেনিস ও ক্যারাম খেলাতেও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগে চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের কর্মী সংগঠক থেকে তিনি নেতৃত্বে উঠে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হবার পরে তিনি সমিতি তথা কর্মচারী আন্দোলনের মুখপত্র 'লালদীঘি'র সম্পাদক নির্বাচিত হন। লালদীঘি পত্রিকায় নতুন লেখক তুলে আনার ক্ষেত্রে তাঁর একান্ত প্রয়াস ছিল। ২০০২ সালে তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরপর দুবার তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কমরেড স্বপন মুখোপাধ্যায় ১৯৭২-৭৭ সালের অস্থির সময়ে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কর্মচারী আন্দোলনে। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণাঞ্চলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভালো স্লোগান দিতে পারতেন।

২০০৭ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি'র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। □

২০ মে সাধারণ ধর্মঘট এবং রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সমাজ

দেবব্রত রায়
যুগ্ম সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

আগামী ২০ মে, ২০২৫ সারা দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট। আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে উদার অর্থনীতি লাগু হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক, কৃষক তথা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ বিরোধী নীতি প্রতিহত করতে ইতিমধ্যেই ২২টি ধর্মঘট হয়েছে। কিন্তু, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী পরিচালিত বিজেপির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার তাদের কর্পোরেট তোষণকারী শ্রমিক, কর্মচারী বিরোধী নীতি থেকে সরে আসার কোনো সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। তাই, গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ নয়াদিল্লীর প্যায়ারেলাল ভবনে দেশের দশটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের জাতীয় ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলি নয়া শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা সহ ১৭ দফা দাবিতে আগামী ২০ মে, ২০২৫ সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে। এই ধর্মঘট দেশের শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকের ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রাম আগামীদিনে আরও তীব্র করে তুলবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী ও কর্পোরেট তোষণকারী নীতির ফলে দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অসাম্য চরম আকার ধারণ করেছে। দেশের জল, জমি, জঙ্গলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ নির্বিচারে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ডাক ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন, মহাকাশ গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রবেশাধিকার দিয়ে জাতীয় সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক, বীমা বেসরকারীকরণ করার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থ কর্পোরেট লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেট কর ক্রমাগত কমিয়ে জি এস টি'র মতো পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে শিল্পপতিদের ব্যাংকের ঋণ মকুব করা হচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও রান্নার গ্যাস সহ পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে রাজকোষের ঘাটতি মেটানো হচ্ছে। খাদ্যশস্য, ওষুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একদিকে মজুরির হার ক্রমাগত কমছে, অন্যদিকে মুনাফার পাহাড় তৈরী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ঘনিষ্ট আদানি, আম্বানিদের মতো শিল্পপতিদের আয় রকেটের গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় কমছে। ফলে দেশে এক ভয়ংকর অসাম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে শুধু প্রান্তিক মানুষই নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে। রেগার মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনের চাপে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেও প্রস্তাবিত 'কৃষি বিপণন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকাঠামো-র' মধ্য দিয়ে পুনরায় তা ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত আইন প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ যাতে লড়াই, আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারে তার জন্য শ্রম আইন বদল করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধর্মের নামে, জাতের নামে মানুষকে ভাগ করা হচ্ছে যাতে মানুষ তার জীবনজীবিকার সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েই আসন্ন ধর্মঘট শ্রমজীবী মানুষ, কৃষিজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রামের নতুন পথ দেখাবে।

আমাদের রাজ্যেও শ্রমিক, কর্মচারীরা এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করার শপথ নিয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও মূল দাবিগুলোর সাথে নিজেদের দাবি যুক্ত করে এই ধর্মঘটে শামিল হব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ধর্মঘটে যেমন কেন্দ্রের শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন বি এম এস যোগ দিচ্ছে না তেমনি রাজ্যের শাসকদলের শ্রমিক বা কর্মচারী সংগঠনগুলোও ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে না। অথচ তারা নাকি কেন্দ্রের নীতিগুলোর প্রধান বিরোধী!

ধর্মঘটের দাবিগুলো মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি আমাদের রাজ্যের সরকার ধর্মঘট রুখতে কতটা নির্মম, নৃশংস হয়ে ওঠে। কারণ, আমাদের রাজ্যের শাসক দল তথা মিডিয়া বর্ণিত কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত "প্রধান বিরোধী মুখ" কেন্দ্রীয় নীতিগুলোর সমর্থক। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সাল পর্যন্ত তাঁর সংসদীয় রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সাংসদ বা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রের সকল জনবিরোধী নীতিকে তিনি হাত তুলে সমর্থন করে এসেছেন। রাজ্যের ক্ষমতায় এসে তিনি কেন্দ্রের সকল জনবিরোধী নীতি এই রাজ্যে লাগু করছেন। কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ অবাধ করতে ক্ষমতায় এসেই "দি ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটিং" (রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৪ চালু করেন। আমাদের মতো কৃষি প্রধান রাজ্যে গত ১৪ বছরে কৃষকদের জীবনে নেমে এসেছে এক চরম সংকট। সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কৃষি উপকরণ, শস্য বীজ, সার, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের কাছে স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বীজ, সার পৌঁছে দেওয়ার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সমবায়গুলো শাসকদলের লুটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা কৃষক মান্ডিগুলো ফড়েদের দখলে চলে গেছে। ফলে, আমাদের রাজ্যেও কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে মহাজনী ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

রাজ্যে শিল্পের অবস্থাও তথৈবচ। বছর বছর ঘটা করে দেশে-বিদেশে শিল্পপতিদের নিয়ে শিল্প সম্মেলনে প্রকল্প ঘোষণা করলেও এই সরকারের আমলে নতুন কোনো শিল্প এরাজ্যে আসেনি। বরঞ্চ, বর্তমান রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত জমি নীতি, শাসকদলের নেতাদের তোলাবাজির ফলে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে বহু ছোট বড় সংস্থা। কেন্দ্রীয় কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে ২২২৭টি কোম্পানি তাদের অফিস এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে চলে গেছে। রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে বড়, মাঝারি ও ছোট মিলিয়ে ২১ হাজার ৫২১টি শিল্প সংস্থা এরাজ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়নি। একদিকে শিল্প নেই, অন্যদিকে সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। রাজ্যের সরকারী দপ্তর, স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিতে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পদ শূন্য পড়ে আছে। ফলে, আমাদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাজের সন্ধানে বাইরের রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে।

এই সরকারের আমলে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এমন কোনো দপ্তর নেই যেখানে দুর্নীতি নেই। একশো দিনের প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা চুরি হয়েছে, আবাস যোজনার টাকা চুরি হয়েছে। দুর্নীতির দায় রাজ্যের মন্ত্রী, আমলাদের হাজতবাস করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি আড়াল করতে আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসককে নৃশংস অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে। রাজ্যের শাসকদল নির্বাচনী বন্ডের নামে ওষুধ কোম্পানীগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছে। আর রাজ্যজুড়ে জাল ও নিম্নমানের ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। হাসপাতালগুলো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ কমছে। ফলে, হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির সূত্র অনুসারে আমাদের রাজ্যেও সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলো শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। ৮২০০টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। কমছে রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বহু আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে স্কুলগুলিতে নিয়োগ দুর্নীতি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৫৭৫২ জন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগও আদালতে বিচারাধীন। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থার কারণে বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। আর যাদের সামর্থ্য নেই তারা শিক্ষাঙ্গন থেকে সরে যাচ্ছে। এই স্কুলছুটদের একটা বড় অংশ তাৎক্ষণিক লাভের আশায় শাসক দলের লুম্পেন বাহিনীর অংশ হয়ে পড়ছে।

রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে। প্রতিদিন রাজ্যের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫

দেশবাসীর ধর্মাচরণের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আক্রমণ

দীপঙ্কর বাগচী

গত ৪ এপ্রিল ১৪ ঘণ্টা দীর্ঘ বিতর্কের শেষে রাজ্যসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৫ গৃহীত হয়েছে। বিলের পক্ষে ১২৮ জন সাংসদ এবং বিপক্ষে ৯৫ জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন। এর আগে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে লোকসভাতেও এই বিল পাশ করিয়ে নেয় কেন্দ্রের শাসকদল। বিলের পক্ষে ২৮৮ জন সাংসদ এবং বিপক্ষে ২৩২ জন সাংসদ ভোট দেন। উভয়কক্ষে গৃহীত হবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। গতবছর আগস্ট মাসে বিলটি সংসদে পেশ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি'তে পাঠানো হয়। ৩১ সদস্যের জেপিসির চেয়ারম্যান ছিলেন কেন্দ্রের শাসকদলের সাংসদ জগদম্বিকা পাল, কমিটিতেও কেন্দ্রের শাসকদলের সংখ্যাধিক্য ছিল। সাধারণত জেপিসি'তে কোনো বিল পাঠানো হলে কমিটির সদস্যরা নিজেদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে উঠে সকল পক্ষের যুক্তি, মতামত শুনে খোলা মনে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে জেপিসি সেই পথে হাঁটেনি। অবিজেপি সদস্যদের নোট অফ ডিসেন্ট বা বিরুদ্ধ মত মূল রিপোর্টে সংযুক্ত না করেই সংখ্যাধিক্যের ভোটের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই বিলের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজন, সংখ্যালঘুরা এবং প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তারা দাবি তুলেছে এই সংশোধনীগুলি দেশের সংবিধানের মর্মবস্তুকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে আঘাতগ্রস্ত করেছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫, পূর্বতন ওয়াকফ আইন ১৯৯৫-কে গুরুতরভাবে সংশোধন করেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই সংশোধনীগুলি বাতিল করার দাবি উঠেছে দেশজুড়ে বিভিন্ন মহল থেকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ, আন্দোলন গড়ে উঠছে।

সংশোধনীগুলি বলার আগে ওয়াকফ এবং আমাদের দেশে ওয়াকফ গঠন ও আইন সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ওয়াকফ কথাটি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো ধর্মীয় বা দাতব্য বা সেবামূলক উদ্দেশ্যে কোনও কিছু বিধিবদ্ধভাবে উৎসর্গ করা বা গচ্ছিত রাখা। এর থেকেই ওয়াকফ সম্পত্তির ধারণা এসেছে। একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ইসলাম অনুমোদিত কোনো ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে উৎসর্গ করেন, তবে ওই উৎসর্গীকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলা হয়। অবশ্য অন্যান্য সব ধর্মেও এভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা সেই ধর্ম অনুমোদিত কোনো দাতব্য বা অন্য উদ্দেশ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দান করার প্রথা রয়েছে। ১৯৫৪ এবং ১৯৯৫ সালের আইনে বলা হয়েছে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করে এবং ইসলামী নীতি মেনে কোনও ব্যক্তি যখন তাঁর স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দান করেন তাদের বলা হয় ওয়াকফ। যিনি দান করবেন তাঁকে ঐ সম্পত্তির আইনত মালিক এবং সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। কোনও সম্পত্তি একবার ওয়াকফ হিসাবে মনোনীত করা হলে তা আর ফেরত নেওয়া যাবে না, বিক্রি করা যাবে না, উপহার দেওয়া যাবে না বা অন্য নামে দানপত্র করা যাবে না, কিংবা উত্তরাধিকার হিসাবে সন্তান-সন্ততিরা পাবে না। এসবই সাধারণ ওয়াকফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ওয়াকফ করা যায় যা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগুলিকে বলা হয় ওয়াকফ-উলাল-আওলাদ। এইভাবেই বিভিন্ন দেশে ওয়াকফ গঠিত হয়েছে।

ভারতে ওয়াকফ গঠিত হয় মূলত মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের আগমনের পরে। সুলতানি আমলে এবং মুঘল আমলে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মুলতানে নিজামের আমলে অবিভক্ত অন্ধ্রে, নবাবী আমলে বাংলায় এবং অন্যান্য রাজ্যে বহু ওয়াকফ সম্পত্তি গঠিত হয়। এইসব ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহৃত হতো বিভিন্ন দাতব্যমূলক কাজে এবং মুসলিম জনগণের সেবায়। ঐ অর্থে তৈরী করা হতো মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরখানা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেই ধারা এখনো চলছে।

মূলত ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করেই ওয়াকফ পরিচালিত হতো। পরে ওয়াকফের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যে হস্তক্ষেপ না করে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবহারের ও কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে ব্রিটিশ শাসকেরা ১৯৩২ সালে প্রথম নির্দিষ্টভাবে মুসলমান ওয়াকফ আইন তৈরি করে। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হলে ভারত সরকার ঐ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ আইন তৈরী করে। এরপরে ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৮৪ সালে এই আইনে আরও কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। আরও পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে নতুন ভাবে ওয়াকফ আইন তৈরি করে। বর্তমানে এই আইনকেই প্রিন্সিপাল আইন বলা হয়। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদীয় সিলেক্ট কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ওই আইনের বেশ কিছু সংশোধনী যুক্ত করে। ১৯৫৪ এবং ১৯৯৫ সালের আইনের ভিত্তিতেই রাজ্যে রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৫ সালের আইনের উপর ৪০টির বেশি সংশোধনী এনেছে।

ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা এবং মোট পরিমাণ নিয়ে সেই অর্থে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। আমাদের দেশে এ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোনও সমীক্ষাও হয়নি। আনরেজিস্টার্ড বহু ওয়াকফ আছে। তবে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সূত্রানুসারে সারা দেশে কমবেশি ৮ লক্ষ ৭০ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি আছে এবং সেগুলিতে মোট জমির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একরের মতো, যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী দেশের স্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট ওয়াকফের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২৮টি এবং অস্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট ওয়াকফ সংখ্যা হলো ১৬,৭১৩টি। এর মধ্যে ডিজিটাল রেকর্ডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৫টি ওয়াকফের। পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষের বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। যার মধ্যে রেকর্ড ভুক্ত ৮০ হাজারেরও বেশি। রাজ্যে এই রেকর্ডভুক্তির কাজ বাম আমলে হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে দেশে প্রতিরক্ষা ও রেল দপ্তরের পরে সবচেয়ে বড় জমির মালিকানা হলো ওয়াকফ সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিতে এখন নজর পড়েছে কর্পোরেটের মালিকদের, এবং তাদের সেবক হলেন কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল। পশ্চিমবাংলা সহ বহু রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তিতে অবৈধ দখলদারি হয়েছে কিংবা বেআইনিভাবে বিক্রি হয়েছে। কোথাও কোথাও সরকার নিজেই ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করেছে বা লিজ দিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লী এবং উত্তরাখণ্ডে এই কাজ হয়েছে। কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কর্পোরেট তোষণ এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মিশেল বানিয়ে সরকার চালাচ্ছে। সেই লক্ষ্য পূরণেই ওয়াকফ আইন সংশোধনী বিল আনা হয়েছে, যা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরুদ্ধ মতামত উপেক্ষা করে আইনে পরিণত করা হয়েছে।

কেন্দ্রের বর্তমান সরকার যে সংশোধনীগুলো এনেছে এবং যে কারণে দেশজুড়ে এই নতুন সংশোধিত আইন বাতিলের দাবি উঠেছে ঃ

* বিলে বলা হয়েছে বোহরা সম্প্রদায় এবং আফগানি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব রাখতে পৃথক পৃথক বোর্ড করা হবে।

বর্তমান বোর্ডগুলি সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করে। অর্থাৎ বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুসলিম জনসাধারণকে ভাগ করতে চাওয়া হয়েছে।

সাধারণভাবে ওয়াকফ বোর্ডগুলি তদারকি করে রাজ্য সরকার। কিন্তু এই বিল

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মহাকাশ দখল

সোমনাথ পোদ্দার

প্রতীক্ষার অবসান

সূর্যাস্ত হতে তখনও ঢের দেরি। ঝকঝকে নীল আকাশ। ফ্লরিন্ডা উপকূলের কাছে মেক্সিকো উপসাগরে আগে থেকেই হাজির ছিল নাসা ও স্পেসএক্সের উদ্ধারকারী দল। নির্দিষ্ট সময়ে আকাশে দৃশ্যমান হল 'ড্রাগন'। বাতাসের স্তর ভেত করতে করতে এগিয়ে এল সে। আগে খুলে গেল চারটি প্যারাশুট। যেন পেঁজা তুলোয় ভর করে ভাসতে ভাসতে নীল জলে নামল স্পেসএক্সের 'ড্রাগন ফ্রিডম'। আগুন্তুকদের দেখতে উপস্থিত হয়েছিল একদল ডলফিন। স্পেসএক্সের ক্যাপসুলটিকে ঘিরে শুরু হল তাদের হুটোপাটি।

ন'মাস পরে ঘরে ফিরল নাসার ভারতীয় বংশোদ্ভুত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। সঙ্গে আরও তিন মহাকাশচারী বুচ উইলমোর, নিক হেগ ও আলেক্সান্দার গরবুনভ। গত বছরের ৬ জুন আটদিনের জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আই. এস. এস.) গিয়েছিলেন সুনীতা ও বুচ। কিন্তু যাত্রার মধ্যেই তাঁদের মহাকাশযান বোরিং স্টারলাইনারের একাধিক যন্ত্রাংশ গোলমাল করতে শুরু করে। কোনো মতে প্রাণ নিয়ে আই এস এস-এ পৌঁছান সুনীতারা। কিন্তু তারপর বহু চেষ্টা করেও বোয়িংয়ের যানটিকে সারানো যায়নি। কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে সুনীতাদের ছাড়াই পৃথিবীতে ফিরে আসে বোয়িংয়ের যান। দুই মহাকাশচারী আটকে পড়েন আই এস এস-এ।

রাজনীতি শুরু

আটক দুই মহাকাশচারী কিভাবে ফিরবেন পৃথিবীতে, সেই নিয়ে শুরু হয় রাজনীতি। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ, তাঁর পূর্বসূরী 'জো বাইডেন' ইচ্ছা করে সুনীতাদের ফিরিয়ে আনেন নি। যদিও তার দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি ট্রাম্প। ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্পেসএক্স সংস্থার মালিক ইলন মাস্কও দাবি করেছেন, তিনি আগেই সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাইডেন তার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন। কিছু প্রাক্তন নভশ্চর মাস্কের বক্তব্যের বিরোধিতা করলে তাঁদের বিরোধী 'ডেমোক্র্যাট' বলে আক্রমণ করেন এই ধনকুবের। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেওয়ার কয়েকদিন পরে ট্রাম্প দাবি করে নাসার এই ব্যর্থতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নির্বাচনে সুবিধা নেওয়ার জন্যই বাইডেন এই কাজ করেছে। ট্রাম্প তার বন্ধু ইলন মাস্ককে বলেন, 'সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে এবং মাস্কও তা করেছেন। প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে বলা হল ''কথা দেওয়া হয়েছিল কথা রাখা হল।'' এমনই সব রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরলেন সুনীতা ও বুচ। বুধবার ভোর ৩টা ২৭ মিনিট। সফল মহাকাশ অভিযান শেষে পৃথিবীতে পদার্পণ।

প্রেক্ষাপট ঃ

গত শতকের ষাটের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল মহাকাশ বিজ্ঞানের সফল প্রয়াস। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ মাত্র তিন বছরে বারো জন মহাকাশচারী অবতরন করলেন চাঁদের বুকে। তার পরবর্তীকালে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন মহাশূন্যে বিভিন্ন উপগ্রহ পাঠিয়ে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীর খুঁটিনাটি তথ্য আবিস্কারের দিকে। মহাকাশকে জয় করতে গেলে সেখানে মানুষের উপনিবেশ তৈরি করতে হবে। এই উচ্চাকাঙ্খার ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে তৈরি হতে শুরু করল ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন (আই এস এস)। ১৯৯৮ সালে এর সূত্রপাত করল রাশিয়া-ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উপরে 'জারিয়া' নামে একটি স্পেস কন্ট্রোল মডিউল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। বছরখানেকের মধ্যে আমেরিকা তাদের নিজস্ব মডিউলকে যুক্ত করল তার সঙ্গে। তারপর আরো অনেক দেশের সহায়তায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করল এক বিশাল স্পেস স্টেশন। আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার এক আশ্চর্য উদাহরণ সৃষ্টি হল। 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন'-এর সাফল্যের মূলে কিন্তু পৃথিবী থেকে সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করার এক নিরাপদ ও নির্ভরশীল মহাকাশযানের ব্যবস্থা চালু রাখা। প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার সয়ূজ ক্যাপসুল এই মহাকাশচারীদের ফেরি করার কাজটি করত। পরে নাসার স্পেস শাটল প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক বিশাল কর্মকাণ্ড চলছিল এই স্পেস স্টেশন-এ। কিন্তু কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ও আর্থিক কারণে ২০১১ সালে স্পেস শাটল প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। তার পরবর্তীকালে মহাকাশচারী বা বিজ্ঞানীদের আই এস এস-এ পাঠাতে আমেরিকাকে নিয়মিত ভাবে রাশিয়ার স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছিল। সয়ূস ক্যাপসুল-এ একজন মহাকাশচারীকে পাঠাতে খরচ হচ্ছিল প্রায় ৩২০ কোটি টাকা।

মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারী সংস্থার প্রবেশ

২০১৪ সালে আমেরিকার সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের প্রভাবে স্পেস স্টেশন-এ যাতায়াত ব্যাহত হতে শুরু করল। নাসা পরিকল্পনা করল মহাকাশে যাতায়াতের বাণিজ্যিক প্রকল্পের--- কোনো বেসরকারী সংস্থা সংযোগকারী মহাকাশ যান তৈরি করবে। নাসা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকবে। মহাকাশচারীদের আই এস এস-এ পাঠানোর বিষয়ে। নানান স্তরে বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দুটি সংস্থার সাথে চুক্তি হল---একটি হল বিমান নির্মাণকারী সংস্থা বোয়িং, আর অন্যটি হল ইলন মাস্কের স্পেস এক্স। বোয়িং-এর তৈরি মহাকাশ যানটির নাম হল 'স্টারলাইনার'; স্পেস এক্স-এর মহাকাশ যানটির নাম 'ক্রু ড্রাগন'। প্রায় বছর পাঁচেক প্রস্তুতির পর ২০১৯-এ দুটি সংস্থাই প্রস্তুতি নিতে শুরু করল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপনের। প্রথম সাফল্য পেল 'ক্রু ড্রাগন'। ২০২০ সালের মে মাসে দুই মহাকাশচারীকে নিয়ে সফলভাবে উড়ল সেটি। ২০২৪-এর মধ্যে আটটি সফল অভিযান সম্পন্ন করল।

এদিকে বোয়িং-এর স্টার লাইনার-এ নানা ত্রুটি ধরা পরছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাজ করছিলেন সুনীতা উইলিয়ামস ও ব্যারি উইলমোর। চার বছর পর গত বছর ৫ জুন তাঁরা স্টারলাইনার-এর প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানে পাড়ি দিলেন। সমস্যা সত্ত্বেও পৌঁছে গেলেন মহাকাশ স্টেশনে। কিন্তু মহাকাশ যানটির সম্বন্ধে নাসার বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হলেন—সন্দেহ, সেটা সুনীতা ও ব্যারিকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে আনতে পারবে কি? ঠিক হল স্টার লাইনার মহাকাশযানটি যাত্রী ছাড়াই ফিরে আসবে; সুনীতা আর ব্যারিকে ফেরত আনবে 'ক্রু ড্রাগন'। শুরু হল প্রতীক্ষা প্রহর গোনা।

ইলন মাস্কের প্রবেশ ঃ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা একাধিকবার আটকে থাকা মহাকাশচারীদের ফিরিয়ে আনার কথা বললেও তা করতে পারেনি। সেই কাজটি করে দেখালো ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স। এখন নাসার কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসাবে নামেই রয়েছেন জেনিট পেট্রো। আসল নিয়ন্ত্র ক্ষমতা ইলন বাস্কের সংস্থার হাতে। ২০০২ সালে তৈরি এই সংস্থা গোটা একটা দেশের গবেষণা কেন্দ্রকে দখল করে নিচ্ছেন। কোন প্রকল্প কী অবস্থার পাশাপাশি আগামীদিনে নাসার প্রকল্প, লক্ষ, এমনকি মঙ্গল অভিযানের রূপরেখা ও এখন বাতলে দিচ্ছেন ইলন মাস্ক। প্রযুক্তি দুনিয়ার 'নয়া অবতার' মাস্ক এখন গোটা পৃথিবীবে নাকি দিশা দেখাবেন। সেই লক্ষ্যে মাস্কের কথায় নাসা-র অ্যাডমিনিস্ট্রেরের পদ থেকে 'বিল নেলসন'-কে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তার অনুগত জেনিট পেট্রোকে।

ইলন মাস্ক আমেরিকার ধনকুবের। তার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায়। তারপর কানাডা ঘুরে শেষে ২০০২ সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছেন। অনেক ধরনের ব্যবসার পাশাপাশি মাস্ক ২০২৫ সাল থেকে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বরিষ্ঠ পরামর্শদাতা হিসাবে হোয়াইট হাউসের অন্দরেই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। এই ঘটনা এক প্রকার নজিরবিহীন। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছাড়া অন্য কোনো অরাজনৈতিক ও অসামরিক ব্যক্তিত্ব হোয়াইট হাউসে বসবাস করেননি। মাস্ক ব্যতিক্রমী, ব্যতিক্রম ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তাই এসব সম্ভব হয়েছে।

এতদিন আমরা জানতাম যে গবেষণা, উদ্ভাবন, বৌদ্ধিক চর্চা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়। দেশ ও দশের সার্বিক কল্যান নিয়ে রাষ্ট্রই ভাববে। কিন্তু সেসব এখন অতীত। মাস্ক দেখালেন বেসরকারী প্রচেষ্টাও কম কিছু নয়। শুধু অর্থের প্রয়োজন। বিপুল অর্থ।

ক্রু ড্রাগনের খরচ ঃ

প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ডলার খরচ হল সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরাতে। ২০২৩-এ আই এস এস-এর রক্ষণাবেক্ষণে নাসা খরচ করেছে ১.৭৬ বিলিয়ন ডলার। ১৪০ মিলিয়ন ও ১.৭৬ বিলিয়ান ডলারের পুরোটাই ঢুকেছে মাস্কের পকেটে। একাধিক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ও মাস্ক বলেছেন, ২০২৪ সালে জুনে তারা ক্ষমতায় থাকলে পাঁজিপুঁথি দেখে কবেই ফিরিয়ে আনতেন সুনীতা ও বুচদের। ন'মাসের যন্ত্রণা সুনীতাদের ভোগ করতে হত না। ১.৭৬ বিলিয়ন ডলারের কয়ক্ষতিতে, ২০২৩-এর বাইডেন জমানাতেই আই এস এস ছানবিন করে মাস্কের ৯৬টা ফ্যালকন রকেট।

প্রদীপের নিচে অন্ধকার ঃ

আমেরিকা টাকা না দেওয়ায় হাইতি, কেনিয়া, লেসোথো, দক্ষিণ সুদান, বুরকিনো, ফাসো, মালি, নাইজেরিয়া ও ইউক্রেনে এইচ আই ভি-র ওষুধের জোগান পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে হু। টাকার অভাবে হু পরিচালিত ৭০০টি মিজলস ও রুবেলা টিটাকরণ কেন্দ্র ঝাঁপ ফেলেছে। বিজ্ঞানের নোবেল আমেরিকার ঝুলিতেই সব থেকে বেশি। তবু মাস্ক-ট্রাম্পের কাছে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় টাকা ঢালা মূর্খামি। তাই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির শিক্ষা গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪০০ মিলিয়ন ডলারের সরকারী অনুদান রাতারাতি বন্ধ। ইজরায়েলের গাজা আক্রমণের প্রতিবাদে কোনওকালে সরব হয়েছিল কলাম্বিয়ার কিছু ছাত্র-ছাত্রী, তারই খেসারত। এ উদাহরণ টেনে ট্রাম্প বলেছেন আমেরিকায় বামপন্থীদের নির্মূল করা তার লক্ষ্য। ১৩ মার্চ কলাম্বিয়ার সঙ্গে জন্স হাপকিন্স ইউনিভার্সিটির ৮০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদানও বন্ধ হয়েছে। ১৭৯৮-এর এলিয়েন এনিমি অ্যাক্টকে ফিরিয়ে এনেছেন ট্রাম্প। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টও যে কালা কানুনের অপপ্রয়োগের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে। সুনীতারা শুধু নন ট্রাম্প-মাস্কের স্বেচ্ছাচারিতায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার ভাগ্যাকাশেই আজ দুর্যোগের ঘনঘটা।

এই অভিযানে গবেষণা ঃ

নাসার সরকারী তথ্য বলছে, খাতায় কলমে এই মিশনের নাম ছিল 'বোয়িং ক্রিউফ্লাইট টেস্ট'। সেখানে তাদের কাজ দেওয়া ছিল টেক অফ, ল্যান্ডিং এবং উড়ানের সময়ে ওই স্টার লাইনার স্পেসক্র্যাফ্টের সার্বিক পারফরম্যান্স এবং তার ইকুইপমেন্ট, স্পেসস্যুট এবং সিট পারফরমেন্স পরীক্ষা করা। শুধু এক্সটেনশন কর্ড দিয়ে স্পেস স্টেশনের সাথে যুক্ত অবস্থায় মহাশূন্যে ভেসে ৯ দফায় ৬২ ঘণ্টা ৯ মিনিট স্পেস-ওয়াক করেছেন সুনীতা, যে নজির অন্য কারো নেই।

এতেই কাজ শেষ হয়নি সুনীতাদের। বুচকে যেখানে সার্বিক মেনটেন্যান্সে বেশি জোর দিতে হয়েছিল, সেখানে সুনীতা মহাকাশে ওয়াটার রিকভারি এবং ফুয়েল সেলস টেকনোলজির রি-অ্যাক্টর বানানোর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরেছেন, যা তারিফ কুড়িয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। বায়ো-নিউট্রিয়েন্ট্রস নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেছেন সুনীতা। যেখানে তিনি হাতে গরমে পরীক্ষা করেছেন উপকারি কিছু ব্যাকটেরিয়া এবং অনুজীবদের নিয়ে যাদের দিয়ে মহাকাশে বসেই আগামী দিনে ফ্রেশ নিউট্রিয়েন্ট বানানো সম্ভব হবে। সুনীতা ও বুচ গবেষণা করে দেখেছেন প্রায় শূন্য মহাকর্ষে (মাইক্রো গ্রাভিটি) কি ফসল উৎপন্ন করা যায়। কোনো ফুল ফুটতে পারে। কোনো জীবানু এই প্রতিকূল পরিবেশে কাবু হয়। উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত এই গবেষণাটির নাম 'ভেজি'। সুনীতা সেখানে তার প্রিয় জিনিয়া ফুল ফুটিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন মহাকাশের আবহাওয়াতেই লেটুস, গাজর উৎপাদন করা সম্ভব। ভারশূন্য অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে একজন মহাকাশচারীর শারীবৃত্তীয় নানা পরিবর্তন ঘটে যায়। হার্ট, কিডনি কিংবা মানুষের অন্যান্য অভ্যন্তরীন অঙ্গে কীভাবে কতটা সক্রিয় থাকে, কোন অঙ্গের ওপর প্রভাব বেশি পড়ে, তা নিয়েও গবেষণা করেছেন।

ভারতে প্রতিক্রিয়া ঃ

'প্রত্যাবর্তনে স্বাগত, ক্রু-৯। পৃথিবী আপনাদের অভাব বোধ করছিল'। সুনীতা উইলিয়ামসরা পৃথিবীতে ফেরার পর তাদের উদ্দেশ্যে এক্স হ্যান্ডলে এই কথা লিখেছেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০০৭ এবং ২০১৩ সালে সুনীতা গুজরাতে নিজের পৈতৃক বাড়িতে যখন এসেছিলেন তখন তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি মোদি। এই বিষয়ে সেই সময় সংবাদপত্রে কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সুনীতার তুতো ভাই হল গুজরাতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পান্ড্য, যিনি ২০০২ সালে দাঙ্গায় গুজরাত প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে মুখ খোলার পর খুন হন। সংবাদমাধ্যমের একাংশ লিখেছিলেন যে হরেন পান্ড্য দাবি করেছিলেন, গোধরায় ট্রেনে আগুনের পরে গুজরাটে দাঙ্গা শুরু হলে উচ্চমহল থেকে পুলিশ কর্তাদের নিষ্ক্রিয় থাকতে বলে ছিলেন। ২০০৩ সালে আততায়ীর গুলিতে খুন হয়ে যান হরেন পান্ড্য। হরেনের মৃত্যুর জন্য গুজরাত প্রশাসনকেই দায়ি করেছিলেন তার বাবা বিট্টল ভাই পান্ড্য। বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণআইয়ারের কাছে গোপন জবানবন্দী দিয়েছিলেন হরেন পান্ড্য। এরপরেই প্রাতভ্রমণের সময়ে তিনি খুন হয়ে যান। পরপর আরো অনেকগুলি খুন হয়েছিল, যে পর্ব শেষ হয় বিচারক বি এইচ লোয়ার মৃত্যুতে। সংবাদে প্রকাশিত হয় সেই সময় মোদির সাথে সাক্ষাতের কোনো কর্মসূচী রাখেননি সুনীতা। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর চেষ্টা করেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। বরং হরেন পান্ড্যের স্ত্রী জাগৃতির সঙ্গেই তিনি সারাক্ষণ ছিলেন। সেই সময় গুজরাত সরকারও সুনীতার জন্য কোনো বিশেষ আয়োজন করেনি।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন 'সুনীতা চাওলা'কে ভারত রত্ন দেওয়া হোক। পরবর্তীকালে ভুল সংশোধন করে সুনীতা উইলিয়ামস উল্লেখ করেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীর এই নাম বিভ্রাটকে 'বাঙালির লজ্জা' বলে উল্লেখ করেন। এই লজ্জার হাত থেকে বাঙালিকে উদ্ধার করতে বিরোধী দলনেতা সুনীতাকে 'সোনিয়া উইলিয়ামস বলে অভিহিত করেন। যদিও পরে তিনিও ভুল শুধরে নেন। আবার এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তিনি মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। যদিও ভারতবর্ষের অন্য কোনো মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি করেননি।

সমকালের হিসেব নিকেশ ঃ

মহাশূন্য থেকে আমাদের বাসভূমির সমতলে ভাবনা যখন গোঁত্তা খেয়ে পড়ে। ঝাঁকুনি দিয়ে থামে স্বপ্নসন্ধানী মস্তিষ্ক। টেলিভিশন, খবরের কাগজ, পাড়ার মোড়ে আড্ডায় কান পাতলে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা শোনা যায়। আসলে গত ২৫-৩০ বছরে আর্থ সামাজিক কাঠামোর তেমন কোনো বদল হয়নি বলেই সমস্যা ও আফসোসের ধরন একই রয়েছে। এমনকি রাজ্য, কেন্দ্র বা বিদেশে ক্ষমতার অদলবদল হলেও রাজনীতির কারবারীদের ওপর ভরসাহীনতা বিন্দুমাত্র কমছে বলে মনে হয় না। মানুষ মহাকাশে গেল, করোনা ভাইরাসের দাপটে স্মৃতির স্মরণি ধরে ফিরে এল স্প্যানিশ ফ্লু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বৌদ্ধিক কাজকর্ম সহজেই হাসিল করা যাচ্ছে। দেশে দ্রুতগতির ট্রেন চলছে। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, দুর্নীতি, অপরাধের সমস্যাগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজনীতির স্লোগান হয়ে উঠেছে হুমকি ভিত্তিক, ভাষা হয়েছে কদর্য থেকে কদর্যতর, ইশতেহারবিহীন নির্বাচনী প্রাচর কৌশলে স্লোগান, কর্মসূচীর প্রচার, এলাকাভিত্তিক সংযোগকে পিছনের সারিতে রেখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নেতা-নেত্রীর মুখের ছবি। বড় বড় ব্যানার। রাস্তায় গড়ে তোলা ফ্লেক্স, বড় তোরন, হাত পাখা, ছাতা, ক্যালেন্ডারের মতো দলীয় প্রতীকের ছবি লাগানো উপহার ইত্যাদি। ভোট যুদ্ধে যাঁরা নামেন তারা কমবেশি আমিত্বে বুঁদ হয়ে থাকেন। ফলে আমি সর্বস্ব প্রচারে ব্যক্তি-মুখের প্রকাশ প্রবল হবে সেটা স্বাভাবিক। যে কারণেই তো 'কাজের মানুষ ও কাছের মানুষ' আমাকে বলো, বাংলা আমাকে চায় এই ধরনের স্লোগান উৎপত্তি। এই 'মানুষ' একজন ব্যক্তি। 'মুখ' তার ব্যক্তিগত পরিচয়। দলীয় পতাকা, প্রতীক ও প্রচার সেখানে গৌন। অতএব জনমত প্রভাবিত করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদ্ধতি ব্যক্তি উদ্যোগে জনসংযোগ। ব্যক্তির ক্যারিশমা দিয়ে ভোটের লড়াই হয় বলে আজকাল দল জেতে না, জেতে ব্যক্তি। তাই দলীয় আবেগ ও আদর্শের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে খরচ সর্বস্ব ব্যক্তি প্রচার এবং ব্যক্তিপুজো।

সমস্যা এখান থেকেই শুরু। কারণ দলের জয়ের জন্য সংগঠন, নীতি, আদর্শ প্রয়োজনীয় হলেও ব্যক্তির জয়ে অত্যাবশক হল অন্যান্য ব্যক্তির বদানত্যতা ও পুঁজির সংস্থান। এই পুঁজির সংস্থান দলীয় ভাবে সংগ্রহ বা ক্রাউড-ফাইন্ডিং করে করা যায় না। করতে হয় ব্যক্তির মাধ্যমে বা কখনও ইলেক্টোরাল বন্ডের সাহায্যে বা বিদেশী

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে

২০ মে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের প্রেক্ষাপট

বিজয় শঙ্কর সিন্‌হা
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির আধিপত্য কায়েম রাখতে নয়া উদারনীতির প্রয়োগের কারণে শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ আরো তীব্র হয়েছে। লগ্নীপুঁজির অবাধ লুণ্ঠন বহু দেশের আর্থিক ও রাজকোষের পরিস্থিতিকে এলোমেলো ও দুর্বল করে ফেলেছে। নয়া উদারবাদের সঙ্কটের কারণে এবং তারই ফলশ্রুতিতে বারে বারে ব্যয় সঙ্কোচনের পদ্ধতি প্রয়োগে উন্নত দেশের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমান বিশ্বে উদারবাদী রাজনীতির কেন্দ্রীয় ধারণাটি বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। যেখানে যেখানে বামপন্থী দলগুলি নিজেদের সংহত ও শক্তিশালী অবস্থায় ধরে রেখেছে, সেখানে জনগণ তাদেরই সমর্থন জানাচ্ছে। অন্যথায় সেই সমর্থন ঢলে পড়ছে উগ্র দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রতি। বর্তমান অবস্থায় নয়া ফ্যাসিবাদই হল উগ্র দক্ষিণপন্থীর চেহারা। সম্প্রতি ফ্রান্সের নির্বাচনেও এই প্রবণতা স্পষ্ট ছিল, নয়া ফ্যাসিবাদী রাজনীতিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে ফরাসি জনসাধারণ নিতান্ত তাড়াহুড়ো করে গড়ে ওঠা বামপন্থী ফ্রন্টকেই সমর্থন জানিয়েছে। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি পদে বামপন্থী প্রার্থীর প্রতি কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে জনগণের ব্যাপক সমর্থন দেখা গেল। এমনকি সে দেশের সংসদ নির্বাচনেও বিপুল জয় পেয়েছে বামপন্থীরা। এসবই হল উদারবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বল হয়ে পড়ার লক্ষণ। উদার অর্থনীতি এক গভীর সঙ্কটগ্রস্ত অবস্থায় চলেছে। ফলে জনসমর্থন তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।

ধ্রুপদী উদারবাদী রাজনৈতিক দর্শনই উদারবাদী রাজনীতির কর্মসূচী নির্ধারণ করেছিল। একদিকে ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র (ক্লাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমি) আরেক দিকে নয়া উদার অর্থনীতি (নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমি)-র উপর নির্ভর করে উদারবাদের রাজনীতি এক দীর্ঘকাল ধরে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল। এই দুটি অবলম্বনেরই মূল কথা অবশ্য একই। উভয় মুক্ত বাজার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বন্দোবস্তটি ওরা সবার আগে তাদের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করেছে। পুঁজিবাদ একটি অমানবিক ব্যবস্থা মালিকের জন্য মুনাফা নিশ্চিত করা ব্যতীত অন্য কোনও সামাজিক ভূমিকাই এর থাকে না। তাই পুঁজিবাদ চিরকাল নিজের চলার পথে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কিংবা নিয়ন্ত্রণ খারিজ করতে চেয়েছে।

নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে অপরিসীম দুর্ভোগ নেমে আসে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা আরও খারাপ, প্রতিদিন সেই দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ের বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রবণতা দেখা দেয়। একে চেপে রাখতেই নিজেদের সম্পদের বাজার দর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে সার্বিক চাহিদাকে স্থিতিশীল রাখতে কোনোরকমে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয় না, সেই বুদবদ ফেটে যায় এবং সঙ্কট দেখা দেয়।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ক্ষমতায় বসে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টালমাটাল অবস্থা তৈরী করেছে। আমেরিকায় অবস্থানরত অভিবাসীদের ক্রীতদাসের মতো শেকল পরিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো বা শুল্ক যুদ্ধ যেভাবে শুরু করেছে তা নজিরবিহীন ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে স্তিমিত যুদ্ধ আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে। বিশ্বে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। এরই সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। এটাই এখন বিশ্ব রাজনীতিতে ট্রাম্পইজম-এর প্রভাব।

ইউরোপ কোনো কোনো দেশে তিরিশের দশকের ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরী হিসাবে আবার কোথাও অনুরূপভাবে নয়া ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, নাৎসি জার্মানির ইহুদীদের গণহত্যাই হোক বা বর্তমান ইজরায়েলের প্যালেস্তাইনে গণহত্যা কিংবা ভারত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, সব ঘটনা প্রমাণ করে, নৈতিকতা ছাড়া গণতন্ত্র শুধু দমন-পীড়নের এক বৈধ উপায়। হিটলার ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। আইন পাশ করেছিলেন আর গণহত্যাও চালিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতর দিয়েই। ইজরায়েলেও জারি আছে গণতন্ত্র। আর বিশ্বে সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ভারত, যেখানে নিয়মিত জোট হয়, আদালত সংবাদ মাধ্যম আছে। সেখানে কি ঘটছে? সি. এ. এ, এন. আর. সি, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পাশ করিয়ে মুসলমান সমাজকে বিশেষ বার্তা দেওয়া, অবাধে ঘৃণা ছড়িয়ে যাওয়া, নাগরিক সমাজের প্রতিবাদীদের চুপ করিয়ে দেওয়া—সবই ঘটছে গণতন্ত্রের আঙিনাতেই। তার মানে এই নয় বামপন্থীরা পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্রাজিল, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, মেক্সিকো, পেরুতে বামপন্থীরা সরকারে আসীন হয়েছে।

আমাদের দেশে পরপর তিনবার আর. এস. এস.-বিজেপি প্রায় এগারো বছর দেশ শাসন করছে। এই সময়ে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ কেমন আছেন তা নিয়ে চর্চা হওয়ার দরকার। দেশের সম্পদের ৪০ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীদের কাছে। বর্তমানে ভারতের ধনী ৫ শতাংশ মানুষের কাছে ৬০ শতাংশ সম্পদ। ২০২০ সালে ধনকুবের সংখ্যা ছিল ১৩২ জন, ২০২২ সালে তা বেড়ে হয় ১৬৬ জন। বর্তমানে তা আরো বেশি। বিশ্বের প্রথম ২০ জন ধনীতম ব্যক্তির তালিকায় রয়েছেন মোদির গুজরাটের দুই জন ব্যবসায়ী। আর. এস. এস.-বিজেপি ও শরিকদলের ২৪০ জন সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ২২৭ জন (৯৫ শতাংশ) কোটিপতি। এদিকে বেকারিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানে ভারত। এমনকি ভুটান ও বাংলাদেশের থেকেও নিচে।

কর্পোরেটের সেবায় ও ধনীদের বিপুল সম্পত্তি ও মুনাফা এই সময় বৃদ্ধি পেয়েছে, এদের সেবায় ব্যাপক ব্যাঙ্ক ঋণ ও কর মকুবের সাথে দেশের সম্পদ পরিকাঠামো বিনা পয়সায় উপহার দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেটগুলির স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ও ব্যাঙ্ক জীবনবীমা বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে এ কাজ করছে। নোট বাতিল, ইলেকটোরাল বন্ড, পি. এম. কেয়ার ফান্ড, নিট স্ক্যাম, আদানির শেয়ার প্রতারণা এসবই দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারী। দেশের কৃষি শিল্প পরিষেবা অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলির অবস্থা ভয়াবহ। চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈ-মাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার নেমে ৫.৪ শতাংশ হয়েছে।

মোদির শাসনে সাধারণ মানুষের জনজীবনে সঙ্কটের তীব্রতা অভূতপূর্ব। এটা বলা যায়, তা অতীতের সমস্ত সঙ্কটের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। দেশের স্বনির্ভর আর্থিক নীতি দুর্বল করেছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেল প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, তেল, কয়লা, ইস্পাত, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি শিল্পকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে গেছে মোদি সরকার। মোদির কৃষক বিরোধী নীতি প্রয়োগের কারণে লক্ষাধিক কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারত ১০৫তম স্থানে অবস্থান করছে। দেশের সাধারণ মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন জীবিকার স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে, তখন তাদের ঐক্য ভাঙার লক্ষে আর. এস. এস.-বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করছে। আর. এস. এস. ও তার শাখাগুলি দেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তোলার কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আর. এস. এস.-বিজেপি ও কর্পোরেট শক্তির সঙ্গে মিতালি করে জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

এরমধ্যেই মোদি সরকার দেশের বর্তমান শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রম আইনগুলি তুলে দিয়ে নতুন শ্রমকোড চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে দিল্লীতে কনভেনশন থেকে আগামী ২০ মে, ২০২৫ সারা দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, যে কোনোভাবে নয়া উদারনীতির পথে দাস প্রথার মতো যে শ্রমকোড, তা প্রতিরোধের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শ্রমিক স্বার্থে কেন্দ্রের চালু শ্রম আইন তুলে দিয়ে যে চারটি শ্রমকোড তৈরি করছে, তার মাধ্যমে আসলে দেশে দাস প্রথা ফিরিয়ে আনতে চাইছে। শ্রমকোড আসলে দাস প্রথার নীল নকশা। এই শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্ত অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের আট ঘণ্টা কাজের দাবি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে এই শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড চালু হল। এই শ্রমকোড কর্পোরেটদের শোষণকে আরও তীব্র করার হাতিয়ার হিসাবে তৈরী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শ্রম কোড নিয়ে বিরোধিতার কথা বাজেট আলোচনার সময়ে স্পষ্ট করেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তাতে আমল দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই অনমনীয় মনোভাব দেখে বাধ্য হয়েই ২০ মে, ২০২৫ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রায় ৫ মাস ধরে শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে ধর্মঘটের সমর্থনে সারা দেশজুড়ে গ্রাম-শহরের বুকে ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি চলছে। শ্রমকোড বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে। শ্রমিকদের এই ধর্মঘটে সমর্থন জানিয়েছে কৃষক সমাজ সহ সব অংশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে আগামী ৩ মে, ২০২৫ কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ দেওয়া হবে।

গত ১৪ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়েছে। আর জি কর-এ পিজিটি ছাত্রীকে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যা সহ নানা ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন কার্যত দলদাসে পরিণত হয়েছে তা প্রমাণিত। এছাড়া রাজ্য সরকারের মদতে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এমতাবস্থায় যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার এবং দুর্নীতি যারা করেছে তাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ ধিক্কার জানিয়ে আন্দোলন চলছে। রাজ্যে প্রায় সর্বত্র দুর্নীতি ও নৈরাজ্য চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সহ একাধিক দপ্তরে দুর্নীতি যা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ আমরাও আক্রান্ত। আজ আর্থিক ও অধিকারগত ন্যায্য আদায়যোগ্য দাবি থেকে আমরা বঞ্চিত। বর্তমানে ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া। পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনা। চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের উপর চরম শোষণ চলছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে লড়াই সংগ্রাম করলে দূরদূরান্তে প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলি করা হচ্ছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বামপন্থী মতাদর্শে অটুট থেকে চরম শত্রু উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে লড়াই করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিয়েই আমাদের সমস্ত প্রতিকূলতাকে ভেদ করেই দেশ ও রাজ্যকে রক্ষা করতে আগামী ২০ মে, ২০২৫ সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হতে রাজ্যের সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্য কনভেনশন

পরিস্থিতির সম্মুখীন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট তোষণকারী জনবিরোধী নীতির ফলে দেশের মানুষের দারিদ্র্য চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। চারিদিকে ক্ষুধা ও অপুষ্টি ছেয়ে গেছে। বেকারি সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়েছে। একদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে কর্পোরেট ও কোম্পানির ট্যাক্স কমিয়ে ওষুধ সহ সমস্ত জিনিসপত্রের ওপর বিপুল পরিমাণ জি এস টি চালু করা হয়েছে যা ঘোর অনৈতিক। মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তেমন অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রামকে নানা দমনমূলক আইনের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করার অভিসন্ধি চলছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে তার জন্য জাতপাত, ধর্ম, ভাষার নামে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়িয়ে মেহনতী মানুষের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেই ঐক্যের স্ফুরণ ঘটাতে হবে ২০ মে'র ধর্মঘটে।

কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি নেতা দীপক ঘোষ, এ আই সি সি টি ইউ নেতা অতনু চক্রবর্তী, টি ইউ সি সি নেতা প্রবীর ব্যানার্জী, এ আই টি ইউ সি নেতা বিপ্লব ভট্ট, এ আই ইউ টি ইউ সি নেতা অশোক দাস, আই এন টি ইউ সি নেতা কামারুজ্জামান কামার, এইচ এম এস নেতা বি সি পাল রায়, বি এস এন এল ই ইউ নেতা অনিমেষ মিত্র এবং ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য। তাঁরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন যে শ্রমকোড চালু হলে শ্রমিকরা ভয়ংকর বিপদে পড়বেন। বীমা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ শিল্প সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের অপচেষ্টা, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি, দীর্ঘদিন ভারতীয় শ্রম সম্মেলন না ডাকা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, এরাজ্যের বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে এসেছে। এই সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। গত দশ বছরেও চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি। গত ১৪ বছরে রাজ্যে চুরি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন এক চরম জায়গায় পৌঁছেছে।

এদিনের কনভেনশন থেকে দাবি তোলা হয়, শ্রমকোড বাতিল করতে হবে, ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে, ৫ বছর পর পর মূল্য সূচকের ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে শ্রমিক কর্মীদের। এছাড়া কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইন প্রণয়ন করতে হবে, সম কাজে সম বেতন দিতে হবে, সরকারী শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে, আদিবাসী তফশিলীদের উচ্ছেদ করে জমি জবরদখল করা বন্ধ করতে হবে, সুনিশ্চিত করতে হবে মানুষের জীবন-জীবিকা, রুজি রোজগার। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

আবারও রক্তাক্ত কাশ্মীর

আশপাশের স্থানীয় মানুষ, যাদের বেশিরভাগটাই কাশ্মীরি, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এদেরই একজন নাজাকত আহমেদ শাহ, নিহত আদিলের খুড়তুতো ভাই, পেশায় গাড়িচালক। তাঁর তৎপরতায় ছত্তিশগড়ের শাসকদলের কর্মী অরবিন্দ আগরওয়াল সহ মোট ১১ জনকে নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ঠেলে বাঁচিয়ে দিলেন নাজাকত।

গোটা দেশের মানুষ এই ঘৃণ্য, বর্বরোচিত সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন। দ্রুত জঙ্গিদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেবার দাবি জানিয়েছে সব রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশ ঐক্যবদ্ধ। প্রতিবাদে, নিন্দায় মুখর হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনগুলিও। জঙ্গি সংগঠনগুলি এবং তাদের মদতদানকারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও স্লোগান উঠছে কাশ্মীরে। একদিকে শোক, অপরদিকে ব্যাপক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে কাশ্মীরি জনগণের প্রতিক্রিয়ায়। সন্ত্রাসবাদীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিরপরাধ পর্যটকদের যেমন স্তম্ভিত করে দিয়েছে ঠিক তেমনই যারা পর্যটনের উপরে নির্ভর করে থাকেন, তাদের রুটিরুজির উপরেও তীব্র আক্রমণ। পর্যটকদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের নিরাপত্তা ও থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন এলাকার অনেক সাধারণ মানুষ। তাদের উচ্চারণ স্পষ্ট; যে নিরপরাধ মানুষ লুটিয়ে পড়লেন সন্ত্রাসীদের গুলিতে তারা আমাদের ভাই, বন্ধু, সহ-নাগরিক আর হত্যালীলার খলনায়করা তাদের শত্রু। উগ্রপন্থীরা শুধুমাত্র পর্যটকদের উপরে নয়, কাশ্মীরের মানুষের রুজিরুটির উপরে হামলা করেছে। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ পর্যটকদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। তাদের চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন। স্থানীয় যুবকরা আহতদের জন্য রক্ত দিয়েছেন। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স থেকে অন্য সকলে প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন আহতদের সুস্থ করার জন্য। সব ধর্ম, সব জাতির মিলিত ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া সন্ত্রাসবাদকে কখনো বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এই সময়ে যদি আমরা সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি রক্ষা করতে না পারি তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যপূরণ হয়ে যাবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যখন ঐক্যবদ্ধ ভারত দরকার, তখনও বিভেদের ছায়া দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো মহলের তৎপরতায়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বদলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হিন্দুত্ববাদী শক্তিরা। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে বিশেষ ধর্মের নাম যুক্ত করে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শুরু হয়েছে সংখ্যালঘু ও সেকুলারিজম বিরোধী প্রচার। ঘৃণ্য প্রচারে সামিল হয়েছে বিভিন্ন প্রিন্ট, ভিস্যুয়াল ও ওয়েব মিডিয়া। ধর্মের পরিচয়ে যে সন্ত্রাসবাদের সাথে লড়াই হয়না আদিল হুসেইন থেকে ঝন্টু আলি শেখের প্রাণ বলিদানের ঘটনাই তা প্রমাণ করে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে সন্ত্রাসবাদ রোধে নোটবন্দী করেছিল, জম্মু-কাশ্মীর ভেঙে তিন টুকরো করা, ৩৭০ ধারা রদ করার পেছনেও একই যুক্তি ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে যে দেশ বা কাশ্মীর উপত্যকা মুক্ত হয়নি,

● সপ্তম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

ধর্মঘট এবং রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সমাজ

বিভিন্ন প্রান্তে মা, বোনেরা আক্রান্ত হচ্ছে। নারী নির্যাতন, নাবালিকা পাচার, নাবালিকা বিবাহে আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে। গণ আন্দোলন দমন করতে পুলিশ প্রশাসন যতটা সক্রিয়, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ঠিক ততটাই নিষ্ক্রিয়। ফলে, সারা রাজ্যজুড়ে একটা দুষ্কৃতিরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের সরকার তাদের এই সার্বিক ব্যর্থতা আড়াল করতে ও রাজনৈতিক স্বার্থে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিচ্ছে। ধর্মীয় উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে আর এস এস ও বিজেপিকে এই রাজ্যে জায়গা করে দিতে ধর্মীয় মেরুকরণ করা হচ্ছে। এর প্রভাব আগামী দিনে আমাদের পরিবারেও এসে পড়বে।

রাজ্যের এইরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও মুক্ত নই। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চরম আর্থিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক আক্রমণের শিকার। বর্তমানে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন পায় এমন কর্মচারীদের ৩৭ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া। অনেক লড়াই, ধর্মঘট করে ষষ্ঠ বেতন কমিশন আদায় করা গেলেও কর্মচারীদের আশা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। এই প্রথম বেতন কমিশনের সুপারিশ জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয়নি। দীর্ঘ টালবাহানার পর বেতন কমিশন কার্যকর করলেও কোনো বকেয়া বেতন প্রদান করা হয়নি। ষষ্ঠ বেতন কমিশনে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৩ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের সর্বনিম্ন বেতনের কর্মচারী এই মুহূর্তে ৬৮০০ টাকা বেতন কম পাচ্ছে। সরকার শুধুমাত্র মহার্ঘ ভাতা কম দিচ্ছে এমন নয়, কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের লড়াই-আন্দোলনের ফলে অর্জিত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার অধিকার অস্বীকার করছে। এমনকি, রোপা ২০১৯-এ কর্মচারীদের মোট বেতনের উপাদানের মধ্যে মহার্ঘভাতাকে গণ্য করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর মর্জিমাফিক মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের দিকে ভিক্ষাদানের মতো ছুঁড়ে দিচ্ছে। সরকার কর্মচারীদের বেতনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ খরচ করছে না। কর্মচারীরা ন্যায্য মহার্ঘভাতা দাবি করলে কর্মচারীদের কার্যত কুকুরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন নিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষক, কর্মচারীদের খলনায়ক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। ''ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনোমিক্স এন্ড স্ট্যাটিসটিক্স''-এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ সালে রাজ্যে প্রতি এক লক্ষ মানুষ পিছু পরিষেবা প্রদানে ৬৭৬ জন সরকারী কর্মী ছিল। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রতি এক লক্ষ মানুষ পিছু কর্মী সংখ্যা ২৩২ জন। ফলে, সরকারী পরিষেবা প্রদানে ব্যাঘাত ঘটছে। অথচ, সরকারী ব্যর্থতার দায় সরকারী কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে এই বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, সাধারণ জনগণ ও কর্মচারীদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।

সরকারী দপ্তরগুলিতে অসংখ্য শূন্য পদ পড়ে আছে। উদার অর্থনীতির ''মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্ন্যান্স'' তত্ত্ব অনুযায়ী সরকারী দপ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে তাতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে। অস্বচ্ছ নিয়োগের স্বার্থে পিএসসি দপ্তরকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী কাজের জন্য চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচারীদের উপর চরম আর্থিক শোষণ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত গায়ের জোরে সংসদে নয়া শ্রম কোড পাস করিয়ে নিলেও শ্রমিক, কর্মচারীদের আন্দোলনের চাপে সেই শ্রম কোড লাগু করতে পারেনি। অথচ, আমাদের রাজ্যের সরকার অলিখিত ভাবে শ্রম কোড বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগ না হওয়ার ফলে কর্মচারীদের উপর ক্রমাগত কাজের চাপ বাড়ছে। ছুটির পর, এমনকি ছুটির দিনেও কর্মচারীদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কর্মচারীদের নির্দিষ্ট কাজের বাইরে অন্য কাজ করতেও বাধ্য করা হচ্ছে। অর্জিত অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই সরকার ট্রেড ইউনিয়ন বিহীন সমাজে বিশ্বাসী। তাই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার অস্বীকার করার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। সার্ভিসরুলে বর্ণিত ধর্মঘটের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করছে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের অপমানজনক ও আতঙ্কের পরিবেশে কাজ করতে হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়ার যে হুমকি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেই সংস্কৃতি আজ প্রশাসনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন কর্মচারীরা। নবান্নে স্লোগান দেওয়ার জন্যে শীর্ষ নেতৃত্বকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে দূরদূরান্তে। কর্মচারীর দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রতিহিংসা মূলক বদলির শিকার হয়েছেন বহু নেতা কর্মী। কিন্তু এত আক্রমণ করেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়া যায়নি। কর্মচারী স্বার্থে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধারাবাহিক লড়াই করে যাচ্ছে। আগামী ২০ মে-র ধর্মঘট সেই লড়াই-সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলবে।

গত ১০ মার্চ, ২০২৩ কর্মচারীদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে ঐতিহাসিক ধর্মঘট রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ভীত রাজ্য প্রশাসন কর্মচারীদের উপর আক্রমণের খাঁড়া নামিয়ে এনেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না, সেদিনের সফল ধর্মঘটের চাপেই অনিচ্ছুক রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে না হলেও তিন দফায় তিন কিস্তি মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই, সেই ধর্মঘটের সাফল্যকে পাথেয় করেই আগামী দিন বকেয়া আর্থিক দাবি আদায়, অর্জিত অধিকার রক্ষার স্বার্থে আগামী ২০ মে, ২০২৫ সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়ে রাজ্যের প্রশাসন স্তব্ধ করে দিতে হবে আমাদের। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫

প্রণয়নের সময়ে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেনি। কৃষিনীতি (বর্তমানে বাতিল), শ্রমনীতি, এমনকি শিক্ষা নীতি রূপায়ণেও কেন্দ্র একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যগুলির ক্ষমতাকে খর্ব করেছে।

* এই সংশোধিত বিলে বলা হয়েছে যে অন্তত ৫ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করছেন কেবল এমন ব্যক্তিই ওয়াকফ সম্পত্তি দান করতে পারবেন। ১৯৯৫ সালের আইনে বলা ছিল যে কোনও ব্যক্তি তা করতে পারেন এবং এটা তার সাংবিধানিক অধিকার। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অধিকারকে খর্ব করতে চাওয়া হয়েছে যাতে অমুসলিমরা কেউ ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করতে পারেন।

১৯৯৫ সালের আইনে বলা আছে ওয়াকফ সম্পত্তি সার্ভে করার জন্য ওয়াকফ বোর্ড সার্ভে কমিশনার, অতিরিক্ত সার্ভে কমিশনার নিযুক্ত করবে। কিন্তু বর্তমান বিলে বলা হয়েছে জেলাশাসক সে কাজ করবেন। ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতাকে খর্ব করে জেলাশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্র ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ চাপাতে চাইছে।

* ১৯৯৫ সালের আইনে বলা আছে ওয়াকফ বোর্ড সমীক্ষা করে ঠিক করতে পারবে কোনটা ওয়াকফ সম্পত্তি। প্রস্তাবিত বিলে সেই সংস্থান তুলে দিয়ে বোর্ডের ক্ষমতা খর্ব করে জেলাশাসকদের হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসকরা সরকারী সম্পত্তিরও রক্ষক। সরকার কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা দাবি করলে জেলাশাসক কোন দিকে দাঁড়াবেন? বিলে আরও বলা হয়েছে যে কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির নথি সহ রেজিষ্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক এবং তা করতে হবে জেলাশাসকের কাছে। কেন এটা হবে? মৌখিক অনুমতির ভিত্তিতে বহু ওয়াকফ তৈরী (Wakf by use) হয়েছে এবং তা লাগু আছে। সেগুলির তাহলে কি হবে? ১৯৯৫ সালের আইনে বলা আছে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সদস্যরা মুসলিম সম্প্রদায়ের হবেন। অথচ নতুন বিলে বলা হয়েছে ঐ কাউন্সিলে অন্তত দু'জন অমুসলিম থাকবেন।

১৯৯৫ আইনে বলা ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয়ে যে সব ট্রাইবুনাল গঠিত হবে সেখানে মুসলিম আইন সম্পর্কে দক্ষতা আছে এমন ব্যক্তিকে রাখতেই হবে। নতুন বিলে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালের আইন মোতাবেক রাজ্য সরকার ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসাবে মুসলিম সাংসদ ও বিধায়কদের মনোনীত করতো। বর্তমানে বিলে বলা হয়েছে মুসলিম হতে হবে এমন নয়, যে কোন সাংসদ, বিধায়ক থাকতে পারবেন।

* ১৯৯৫ সালের আইনে বলা আছে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে রাজ্য সরকারগুলি ওয়াকফ ট্রাইবুনাল তৈরি করবে এবং ৭(১) ধারায় বলা আছে সেই ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত। বর্তমান বিলে ৭(১) ধারাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের।

* নতুন বিলে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াকফ সম্পত্তির হিসাব পরীক্ষা করার বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ১৯৯৫ সালের আইনে ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য সরকার এই কাজ করতো। এটা রাজ্য সরকারের কাজের উপর এবং ওয়াকফ বোর্ডগুলির ক্ষমতার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সব ধর্ম সমান। সব ধর্মের সমান অধিকার। যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন সেই ধর্মালম্বীরাই। স্বাধীন ভারতে এই রীতিই চলে আসছে। সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ ধর্ম ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার পাবলিক অর্ডার, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য—এই তিনটি বিষয়ের শর্তাধীন। যেভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিন্দুরাই পরিচালনা করেন। একইভাবে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন। এটাই হওয়া উচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। এই নতুন বিলে জেলাশাসকদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা ওয়াকফ বোর্ড বা পর্ষদের ক্ষমতা অনৈতিকভাবে কেড়ে নিয়ে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিকাংশ ওয়াকফই মৌখিক ঘোষণার দ্বারা সৃষ্ট এবং সেই কারণেই ব্যবহার দ্বারা ওয়াকফ (wakf by use) এতদিন আইন স্বীকৃত ছিল। নতুন সংশোধিত আইন এই ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট ওয়াকফ তুলে দিয়েছে। এই বিষয়টি আগামীদিনে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। নতুন সংশোধিত ওয়াকফ আইনে ওয়াকফ পর্ষদগুলিতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে, যা আগামীদিনে সংখ্যাগুরুর আগ্রাসী মনোভাবকে ইন্ধন যোগানোর সম্ভাবনা উস্কে দিচ্ছে। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের ১০৭ ধারায় বেদখল হওয়া ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা ছিলনা। কিন্তু সংশোধিত আইনে এই ১০৭ ধারা বিলোপ করা হয়েছে।

এর ফলে বেদখল হওয়া ওয়াকফ সম্পত্তি নির্দিষ্ট সময়ের পর আর উদ্ধার করা যাবে না। বাতিল করা হয়েছে পূর্বতন ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারা। এর ফলে ক্ষুন্ন হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ড এবং পর্ষদগুলির ক্ষমতা, ওয়াকফ ট্রাইবুনালের ক্ষমতা। অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে জেলাশাসকদের হাতে। এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে বামপন্থী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনগুলি।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি ভারতের সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। এই বিলে ওয়াকফ সম্পত্তি ও তার পরিচালনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নিতে চাওয়া হয়েছে, যা লঙ্ঘন করেছে সংবিধানের ২৫ নং ধারাকে। ওয়াকফ বোর্ড এবং ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বিলে তা সংবিধানের ১৪ ও ১৫ ধারাকে লঙ্ঘন করেছে। ৫ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করছেন এমন ব্যক্তিই দান করতে পারবেন, এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় প্রমাণ করতে বাধ্য করার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সংবিধানের ২৬ ধারার পরিপন্থী। ঐ ধারায় দেশের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়গুলি পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বামপন্থী দলগুলি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন এই নতুন আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে। তারা সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছে। ৭৩টি পিটিশনের শুনানি শুরু হয়েছে। আইনে একাধিক সংস্থান ঘিরে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। একটি ধারায় বলা হয়েছে যে মুসলিমদের ধর্মীয় সম্পত্তি ওয়াকফ পরিচালনার বোর্ডে রাখা হবে অ-মুসলিমদেরও। তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেছেন, ''এখন থেকে কি মুসলিমদেরও অনুমতি দেওয়া হবে হিন্দুদের দান করা সম্পত্তির বোর্ডের সদস্য হওয়ার?'' এছাড়াও আদালত প্রশ্ন তোলে ব্যবহারের ধরনের বিচারে যে সম্পত্তি ওয়াকফ বলে বিবেচিত হয় সেগুলি কী নতুন আইনে 'ডি-নোটিফাই' করা হবে? প্রধান বিচারপতি তাঁর মন্তব্যে বলেন, ''আপনারা অতীতের পুনর্লিখন করতে পারেন না''।

কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে গরিব সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে নাকি ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। একদিকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গোরক্ষার নামে সংখ্যালঘুদের নিশানা করছে। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে। অভিবাসন আইন তৈরী করেছে। উপাসনাস্থল আইনকে নস্যাৎ করে সংখ্যালঘুদের নিশানা করছে। আবার তারাই কিনা দাবি করছে গরিব সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংশোধনী বিল এর চেয়ে হাস্যকর যুক্তি আর হয় না। সরকার দাবি করছে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয় বাড়িয়ে মুসলিম সমাজে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য নাকি এই আইন আনা হয়েছে। এটাও একটি হাস্যকর যুক্তি। কর্তৃত্ববাদী হিন্দুত্বের প্রসারের লক্ষ্যে দেশের নয়া ফ্যাসিবাদী চরিত্রের শাসক যেভাবে সংখ্যালঘুদের আজ দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে চাইছে, নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইন সেই লক্ষ্যেই নেওয়া একটি পদক্ষেপ।

এরাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসকদল এই নতুন আইনকে নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে ব্যবহার করতে চাইছে নিজেদের রাজনৈতিক লাভের জন্য। রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে অশান্তির আগুন জ্বালাতে তৎপর এই দুই রাজনৈতিক দলই। লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। এই নোংরা রাজনীতির বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

ওয়াকফ সংশোধনীগুলির বিরুদ্ধে কেবল মুসলিমদেরই রাস্তায় নামলে হবে না, কেন না সেক্ষেত্রে সঙ্ঘ পরিবার চাইবে মুসলিম বিরোধী হিন্দুত্ববাদী জিগিরকে আরও তীব্র করতে। তাই সব অংশের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে জোটবদ্ধ করে পথে নেমে এই বিল বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

মহাকাশ দখল

আনুকূল্যে। যেভাবেই অর্থ সংস্থান হোক না কেন, মার্কিন মুলুকে এর প্রধান হোতা ইলন মাস্ক, আর দেশে করা সে তো সবাই জানে (আদানি / আম্বানি)। এ ধরনের অর্থ সংস্থানকারী সকলেই কিন্তু ব্যবসায়ী। নির্বাচনী প্রচারে পুঁজির জোগান দেওয়াকে তারা নিজস্ব ব্যবসার বিনিয়োগ হিসাবেই দেখেন। সুতরাং বিনিয়োগের প্রতিদান প্রত্যাশা করা কিছু অযৌক্তিক নয়। সেই প্রতিদান নির্বাচিত সরকারকেই দিতে হয়। দিতে হয় জনগণের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর বরাদ্দ অর্থ কাটছাঁট করে। কিংবা কোনো অনৈতিক সুবিধার বন্দোবস্ত করে। অথবা, রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগগুলিকে অ-দক্ষতার অজুহাতে বন্ধ করে দিয়ে বেসরকারী ব্যবসার রাস্তা প্রশস্ত করে। কারণ প্রচারেই প্রসার। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম যে এই ধরনের বেসরকারী পুঁজিচালিত গণতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তকে উসকানি দেবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী। তবে এই সমস্যা শুধু ভারত বা আমেরিকায় নয়, ইংল্যান্ডের মাইকেল অ্যাশক্রফট, চিনের জ্যাক মা, রাশিয়ার রোমান আব্রামোচিভ, নাইজেরিয়ার আলিকো ডান গোটে, জার্মানির জোহানেস হুথ, ফ্রান্সের শান্তাল রোলোরে সহ আরো অনেকে।

সমকালীন গনতন্ত্র দেশ-নির্বিশেষে পুঁজির মোহে আবিষ্ট এবং পুঁজিও তার নিজস্ব নিয়মে সেই কারণেই নির্ধারণ করতে চায় গণতন্ত্র ও সাধারণ নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি। তাই ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে তাঁরা সম্ভাব্য বিজয়ীর কাছ থেকে নির্বাচন পরবর্তী বছরগুলিতে বদান্যতা লাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চায়। এতে রাজনৈতিক দল এবং তাদের অর্থ সংস্থানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয়েরই লাভ হবে। এটা যেমন নিশ্চিত, পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত যে 'জন' কল্যাণকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী যে নির্বাচন হয়, সেই 'জন'-র ক্ষতির আশঙ্কা সব থেকে বেশি।

পরিশেষ ঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বাজার অর্থনীতি, বেসরকারী উদ্যোগকে জোর করে প্রতিহত করা যাবে না। এগুলি হয়তো সময়ের দাবি। তবে অতি নির্ভরশীলতার মাসুল গুনতে হবে নিশ্চয়ই। সেই সতর্কতা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কারণ তারাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই মাস্কের ড্রাগন মহাকাশযানে আপত্তি নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরামর্শ তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু এটাও চাই যে ইলন মাস্কের উদ্যোগের ফল মিলন বাস্কের বাড়ির উঠোনেও পৌঁছোক। সেই পৌঁছোনোর রাস্তায় আদানির বেসরকারী পরিষেবা থাকতেই পারে, তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় যথার্থ শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র এড়িয়ে যেতে পারে না। নীল আকাশের বুক চিরে উড়ুক চন্দ্রযান, পাশাপাশি 'ঝলসানো রুটি' ভ্রম না করে সবাই যেন মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদের স্নিগ্ধতা খুঁজতে পারে। এটাই তো সুনীতা সহ আমরা সবাই চাই। □

মুখপত্র সাবকমিটি ও রাজেন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি কর্মচারী ভবনে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে 'আড্ডা চক্র' অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল ঃ ''সংখ্যাগুরু মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং ওয়াকফ বিল''। এই চক্র চলবে, আগামীর বিষয় ঃ ''প্রসঙ্গ-প্রোপাগাণ্ডা এবং এজিটেশন''। প্রায় ৩ ঘণ্টার আড্ডায় ভাগে ভাগে উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকেই মতামত ব্যক্ত করেন। □

৭–৯ এপ্রিল ’২৫ মহকুমা স্তরে সাত দফা দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

চুঁচড়া, হুগলী

আরামবাগ, হুগলী

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

মালবাজার, জলপাইগুড়ি

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সদর মহকুমা, জলপাইগুড়ি

এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ঝাড়গ্রাম

কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

শ্রীরামপুর, হুগলী

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ডোমকল, মুর্শিদাবাদ

আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সদর মহকুমা, পশ্চিম মেদিনীপুর

সিউড়ি, বীরভূম

খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

সদর মহকুমা, কোচবিহার

সদর মহকুমা, পূর্ব বর্ধমান

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

২৫৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল

২২ এপ্রিল ২০২৪-এ বিশেষ বেঞ্চ তাদের ২৮২ পাতার রায় ঘোষণা করে, যেখানে ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়, অর্থাৎ ২৫,৭৫৩ জনের মধ্যে ২৫৭৫২ জন চাকরি হারান। ব্যতিক্রম একজন, সোমা দাস, যিনি ক্যান্সার আক্রান্ত। পাশাপাশি সমস্ত ও এম আর শিট স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যারা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন। চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের বেতন ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, ওই টাকা সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে ওই মামলায় সিবিআইকে আরও তদন্ত করে তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের এই রায়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ এপ্রিল পুনরায় রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে রাজ্য। ২৯ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। আলাদাভাবে শীর্ষ আদালতে মামলা করে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর, এস এস সি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। দফায় দফায় মামলা করেন চাকরিহারারাও। ৭ মে ২০২৪ হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট, তবে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বেআইনিভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন, সিবিআইকে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ১৬ জুলাই ২০২৪ শীর্ষ আদালত জানায়, এই মামলায় মোট পাঁচটি পক্ষ রয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এস এস সি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, হাইকোর্টের মূল মামলাকারীরা হাইকোর্টের নির্দেশে যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে এবং সিবিআই-এর বক্তব্য শুনবে আদালত। মোট ২০ বার শুনানি হয়েছে এই মামলার। প্রায় ৪০০ জন আইনজীবী এই মামলায় অংশ নেন। প্রায় ২২ লক্ষ বঞ্চিত চাকুরী প্রার্থীদের উকিলের হিসাব অনুযায়ী দশ হাজারের কিছু বেশি টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। এস এস সি-র হলফনামা অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার অর্থাৎ এস এস সি স্বীকার করে নিয়েছে এদের চাকরি হয়েছে অবৈধভাবে যদিও এই তালিকা বার বার চাওয়া সত্ত্বেও না হাইকোর্ট, না সুপ্রিম কোর্ট কোথাও জমা দেয়নি এস এস সি। যার ফলে ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পরবর্তীতে ৩ এপ্রিল ২০২৫ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে পুরো প্যানেলই বাতিল করে দেয় শীর্ষ আদালত। ৪১ পাতার রায়ে বলা হয়েছে ১৭ রকমের পদ্ধতিতে দুর্নীতি হয়েছে। এস এস সি ও এম আর শিট স্ক্যান এবং মূল্যায়নের জন্য ‘নাইসা’ নামের একটি সংস্থাকে বরাত দিয়েছিল যে পদক্ষেপ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে। নাইসা আবার অন্য একটি সংস্থাকে এই উত্তরপত্রের স্ক্যান করতে দেয় এবং তারা এস এস সি দপ্তরে এসে সেই কাজ করে অথচ ওই সংস্থাকে এস এস সি আদৌ দায়িত্ব দেয় নি, ফলে বরাত পাওয়ার পরও বিষয়টি বেআইনি থেকে গেছে এরপর উত্তরপত্রের আসল কপি (ও এম আর শিট) এস এস সি নষ্ট করে দেয়। সেক্ষেত্রে উত্তরপত্রের মিরর ইমেজ এস এস সি-র সার্ভারে সংরক্ষিত থাকার কথা কিন্তু সিবিআই আদালতে জানায় ও এম আর শিট স্ক্যান করে তার মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করেই আসল কপি নষ্ট করেছে এস এস সি। চূড়ান্তভাবে এস এস সি আদালতে জানিয়েছিল ১৪৯৮ জন প্যানেল বহির্ভূতভাবে চাকরি পেয়েছেন, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং হয়েছিল ৯২৬ জনের এবং ৪০৯১ জনের ক্ষেত্রে ও এম আর শিট বিকৃতি করা হয়েছিল।

রায়ের ১৮ পাতায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে আমাদের মতে এটা এমন এক ঘটনা যেখানে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া দুর্নীতিযুক্ত এবং কলঙ্কিত হয়ে পড়েছে বৃহত্তরভাবে কারসাজি এবং জালিয়াতি করা হয়েছে এবং এর সাথে আড়াল করার প্রচেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে সংশোধন করে বাইরে এবং আংশিকভাবে পুনরুদ্ধারের বাইরে নিয়ে গেছে। যার ফলে পুরো নিয়োগের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শুধুমাত্র যোগ্য চাকুরীরতরা নয় প্রায় ২২ লক্ষ চাকুরী প্রার্থী যারা ২০১৬ সালে পরীক্ষায় বসেছিলেন, তারা অভিযোগ করেছিলেন সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকুরি পেয়েছেন বহু অযোগ্যের র‍্যাঙ্ক জাম্পিং হয়েছে—আমরা চাই এই সকল যোগ্য শিক্ষকের চাকুরির ব্যবস্থা অবিলম্বে রাজ্য সরকার এবং এস এস সি দায়িত্ব সহকারে দ্রুততার সঙ্গে সঠিকভাবে করতে হবে। ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করে পুনরায় দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকলকে দ্রুততার সঙ্গে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের গর্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার বিরুদ্ধে এবং সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে তাদের লড়াই জারী রাখবে। □

দেবাশীষ রায়

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

আবারও রক্তাক্ত কাশ্মীর

২২ এপ্রিলের ঘটনাই তার প্রমাণ। বরং এই সময়কালেই গড়ে উঠেছে টিআরএফ-এর মতো উগ্রবাদী সংগঠন যারা লস্করের ছায়া সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ত্রুটির অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠছে তা স্বীকার করেই সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। এই লড়াইয়ে দেশ ঐক্যবদ্ধ। গোটা দেশের মানুষকে এক হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতির উপরে যদি আঘাত আসে তাহলে যারা এই নৃশংস হামলা চালিয়েছে তাদের লক্ষ্যপূরণ হবে। দেশের সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে হিংসা দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে কোন ধর্মের মানুষকেই নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তাও দিতে পারে না। একমাত্র জাগ্রত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শুভবুদ্ধি দেশের এই সঙ্কটকালে অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা হয়ে উঠতে পারে।

এরাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং শ্রমিক কর্মচারী ও শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলন মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। দাবি জানানো হয়েছে কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের। □

দীপঙ্কর বাগচী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
52nd Year, 11th & 12th Edition, March-April, 2025
Regd. No. : 18484/71

অস্থায়ী কর্মচারীদের পাশে স্থায়ী কর্মচারীরা

গত ১১ এপ্রিল '২৫ 'অস্থায়ী কর্মচারীদের পাশে স্থায়ী কর্মচারীরা' এই স্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A)-র উদ্যোগে রানী রাসমনি এভিনিউতে এক সুবিশাল কর্মচারী সমাবেশ হয়। সমকাজে সমবেতন এবং চাকরিতে নিরাপত্তা সরকারী কর্মচারীদের সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকারের মান্যতা আদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের অস্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের পাশে আছেন স্থায়ী কর্মচারীরা। এদিন সরকারী ক্ষেত্রে কর্মরত বিপুল সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের অনতিবিলম্বে স্থায়ীকরণ এবং তাঁদের যাবতীয় নিরাপত্তার সুনিশ্চিতকরণের দাবি নিয়ে (W.B.M.O.A)-র তরফ থেকে ৮ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় নবান্নে। অস্থায়ী কর্মচারীদের পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, বিমার সুরক্ষা, অবসরকালীন ভাতা হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি সহ ৮টি দাবি এইদিন রাজ্য অর্থ সচিবের দপ্তরে পেশ করা হয়। এরপর দুপুর ১২টা থেকে রানি রাসমণি রোডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারী নির্বিশেষে সকলেই এদিনের সমাবেশে শামিল হন। এদিনের সমাবেশটি পরিচালনা করেন শেখ আখতার আলি, সুজিত দত্ত সমীর দে-কে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অরূপ চন্দ প্রমুখ। সভায় ৮ দফা দাবি প্রস্তাব পাঠ করেন গোপা দাস।

এই সমাবেশের মুখ্য বক্তা ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই-র রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী।

সমাবেশে মীনাক্ষী মুখার্জি স্পষ্টতই বলেন, সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা সহ সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামো, নিরাপত্তা এবং সরকারী কর্মচারীদের সম্মানের সঙ্গে কাজ করার পরিবেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্নীতিবাজি করে নষ্ট করছে রাজ্য সরকার, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারীকরণ প্রকল্পকে সহজেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়। বিগত কয়েক বছরে বহু সরকারী স্কুলে তালা পড়েছে। যোগ্য শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে স্থায়ী ও ধারাবাহিক কাজে ৫ হাজার, ১০ হাজার, ১৫ হাজার টাকা বেতনে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে সস্তায় তাঁদের শ্রম কিনে নিজেদের পকেট ভরানোর প্রবণতা যেমন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে, তেমনই সমান হারে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে ২২ হাজার মদের দোকান তৈরি হয়েছে।

এদিনের সমাবেশে মীনাক্ষী মুখার্জি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ভারতের সংবিধানে কাউকে বেগার খাটানোর নির্দেশ কোনও সরকারকে দেওয়া হয়নি, সেখানে পরিষ্কার করে উল্লেখ করা আছে স্থায়ী কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যাবে না। সরকারের কোনো বিভাগে কর্মী দরকার হলে সেই বিভাগ সরকারকে জানাবে, সরকার বিজ্ঞপ্তি বের করবে, পরীক্ষা নেবে, কৃতকার্যদের কাউন্সেলিং করে নিয়োগ করা হবে। এই সহজ কাজটুকু করতে গিয়ে ইস্ট জর্জিয়া থেকে পাশ করা মুখ্যমন্ত্রীর এত হোঁচট খেতে হচ্ছে কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সেটা না করে, অস্থায়ী কর্মীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে, সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ না দিয়ে ২২ হাজার মদের দোকান থেকে আসা লভ্যাংশে পকেট ভরাচ্ছেন আর ক্রমাগত মন্দির, মসজিদ, গির্জার চক্করে মানুষকে ভুলিয়ে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্রমাগত বিভেদ তৈরি করে চলেছেন, যাতে আসল বিষয়ে মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। মানুষ এত সহজে ভুলবে না, আর সে জন্যেই আগামী ২০ মে রাজ্যজুড়ে শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। □

এস ই এস এ সমিতির শতবর্ষপূর্তির সূচনা কর্মসূচী

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের বর্ষব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হলো ৫ এপ্রিল ২০২৫ বিধাননগর বিদ্যুৎ ভবনের প্রেক্ষাগৃহে। তার আগে বেলা ১১টায় বৈশাখী মোড় থেকে সুসজ্জিত মিছিল শুরু হয় আট শতাধিক সদস্য তার পরিবার পরিজন নিয়ে। এরপর বিদ্যুৎ ভবনে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের অন্যতম সহ সভাপতি স্বপন রায়। প্রথমেই মুরারী মোহন মিত্র, বিমল ঘোষদস্তিদার শুভাশীষ গুপ্ত সহ পূর্বতন নেতৃত্বদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রারম্ভিক ভাষণ দেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে শতবর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা উদ্বোধক কমরেড বিশ্বজিত গুপ্ত চৌধুরী। তিনি তার বক্তৃতায় এই সমিতির কর্মচারী আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। জনস্বার্থে প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবদান নিয়ে আলোচনাও করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি এ্যাকাডেমিক কর্মসূচিতে বাইরে

থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু লিখিত বক্তব্য পাঠিয়ে ছিলেন, সভায় সেই বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মন্ডলীর পক্ষে অমর সরকার। বিশেষ অতিথি কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখাজরী জরুরি সাংগঠনিক কারণে কলকাতার বাইরে থাকায় উপস্থিত হতে পারেন নি। এরপর সভার বিশেষ অতিথি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আজকের সমাজে প্রযুক্তিবিদ ও তাদের পেশার সমস্যা নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন ৫০% IIT/ NIT র ছেলেরা কাজ পাচ্ছেনা, যারাও পাচ্ছে সেটা আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট। অর্থাৎ বছরে ৪-৫ লাখ টাকা, (LPA)। AI সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন সমাজে প্রযুক্তির মালিকানা যার হাতে থাকবে তার দ্বারা এর সুফল কারা পাবে, অর্থাৎ সমাজ পাবে না কেবলই মালিকের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার হবে তা নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে একজন প্রযুক্তিবিদ হিসাবে এই সংগঠনের করণীয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন।

১০০ ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সভার মঞ্চ থেকে দুজন ছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

প্রবীণ নেতৃত্ব ও সমিতির আজীবন সদস্য প্রায় নবতীপর শুভাশীষ গুপ্ত সমিতির শতবর্ষের সূচনার এই সভাকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে বর্ণনা করেন। বিশাল বর্ণময় মিছিল, সভায় উপচে পড়া ভিড় আমাদের উদ্দীপিত করেছে। সমিতির শত বর্ষের সাফল্য কেবল মাত্র সমিতির সাফল্য নয়, এই সাফল্যের মর্মে আছে সমগ্র কর্মচারী আন্দোলনের শক্তি।

এরপর সভাপতিমন্ডলীর পক্ষে মনোজ চক্রবর্তী তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন আমাদের শতবর্ষের গর্বকে বুকে ধারণ করেই আজকের প্রজন্মের নেতৃত্বকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন কর্মসূচী নিজে কোন লক্ষ নয়, কিন্তু কর্মসূচি একাধিক লক্ষপূরণের জন্য রূপায়ণ করতে হয়। এই শতবর্ষের অনুষ্ঠানও সেই লক্ষ পূরণে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়াতে হবে।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী এবং সবার পথ নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'শীতল পার্টি' পরিবেশন করেন সঞ্জিতা। □

সুমন কান্তি নাগ

পুস্তক পর্যালোচনা

স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের গর্ভে শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন। বিগত শতাব্দীর শুরুতেই একদিকে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই ও অপর দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন স্বপ্ন দেখালো, এই স্বপ্ন নিয়েই ১৯২০ সালে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯২০ সালে গড়ে ওঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলন-জাতীয়তা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংগঠন গড়ে ওঠার বাস্তবতা তৈরী হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দেশের জনগন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও দেশজুড়ে দারিদ্র, অপুষ্টি, অশিক্ষা, বেকারী, বৈষম্য ও জাতপাতের বেড়াজাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বপ্নপূরণ করতে পারল না। পরাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে গড়ে ওঠা দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনসহ সমাজের নানা অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলি দেশের সংখ্যাগড়িষ্ঠ মানুষের সেই স্বপ্নগুলিকে সাকার করার পথে নেমেছে, সংগ্রাম-আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমজীবী আদর্শকে বহন করে চলেছে আজও। ভারতের এমনই ২২টি গণসংগঠনের অতীত ঐতিহ্য ও পরম্পারকে তথ্য ও ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলীকে "গণসংগঠন ও আন্দোলনের ইতিহাস" নামক বইটিতে লেখক দীপক মিত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছেন।

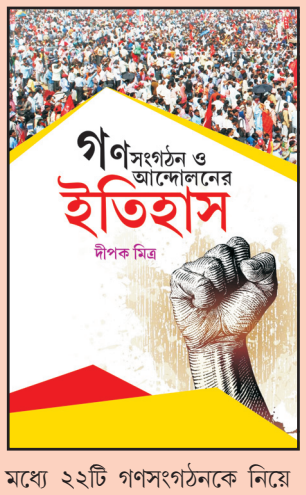

সমগ্র বইটির ২৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ২২টি গণসংগঠনকে নিয়ে ২২টি অধ্যায় ছাড়াও লেখক দীপক মিত্রের নিজের কথা, কিছু তথ্যসূত্র ও আন্দোলনের বিভিন্ন আলোকচিত্র যুক্ত করা হয়েছে। বইটিতে ভূমিকা লিখেছেন রাজ্যের গণআন্দোলনের নেতা ও বামফ্রন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব। লেখক নিজে একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে প্রায় ৪০ বছর আগে চাকরিচ্যুত হন, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ লেখক যুক্ত হয়ে পড়েন রাজ্যসহ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। বর্তমানে তিনি "সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস" (সি আই টি ইউ)-র রাজ্যের সহসভাপতি ও সর্বভারতীয় জেনারেল কাউন্সিল সদস্য। নিজের দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজ্যের এই ২২টি গণসংগঠনগুলিকে দেখা ও তাদের আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন যার প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়ে গিয়েছে বইটির প্রতিটি পরতে। রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, খেত মজুর, ছাত্র, যুব, মহিলা, গণনাট্য, লেখক-শিল্পী সংগঠনসহ বস্তি ও উদ্বাস্ত আন্দোলনের পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের মধ্যে বহু সংগঠনের গড়ে ওঠা ও এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসকে এই বইটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক।

দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণী আন্দোলনগুলির এগিয়ে চলার পাশাপাশি সমাজের অভ্যন্তরের প্রগতিশীল অপর গণসংগঠনগুলির গড়ে ওঠা ও এগিয়ে চলাকে একটি ২৬৮ পাতার বইয়ে তুলে ধরা খুবই কঠিন কাজ। এই সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখেও এই ধরণের একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়ে লেখক পূর্বেই একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন শুধু নয় বইটিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাই বিপুল তথ্যের ভাণ্ডার এই বইটি পাঠ করার সময় মাঝে মাঝে কিছুটা একঘেয়েমিপূর্ণ মনে হলেও, আদতে বইটিতে এই সবকটি গণসংগঠনের তৈরী হওয়া ও বিকাশের ক্ষেত্রে আড়ালে থাকা আদর্শকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সংখ্যা ও তথ্য অনেক ক্ষেত্রে বইটিকে ভারাক্রান্ত করলেও পাঠকের কাছে সঠিক তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়কে চিরে চিরে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে লেখক বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বে সংগ্রাম আন্দোলনগুলি গড়ে ওঠা ও তা থেকে আজকের প্রজন্মের কর্মীদের শিক্ষা নেওয়ার এক আকরগ্রন্থ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা এক কথায় অনবদ্য। □

সুমন কান্তি নাগ

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।